77·1978

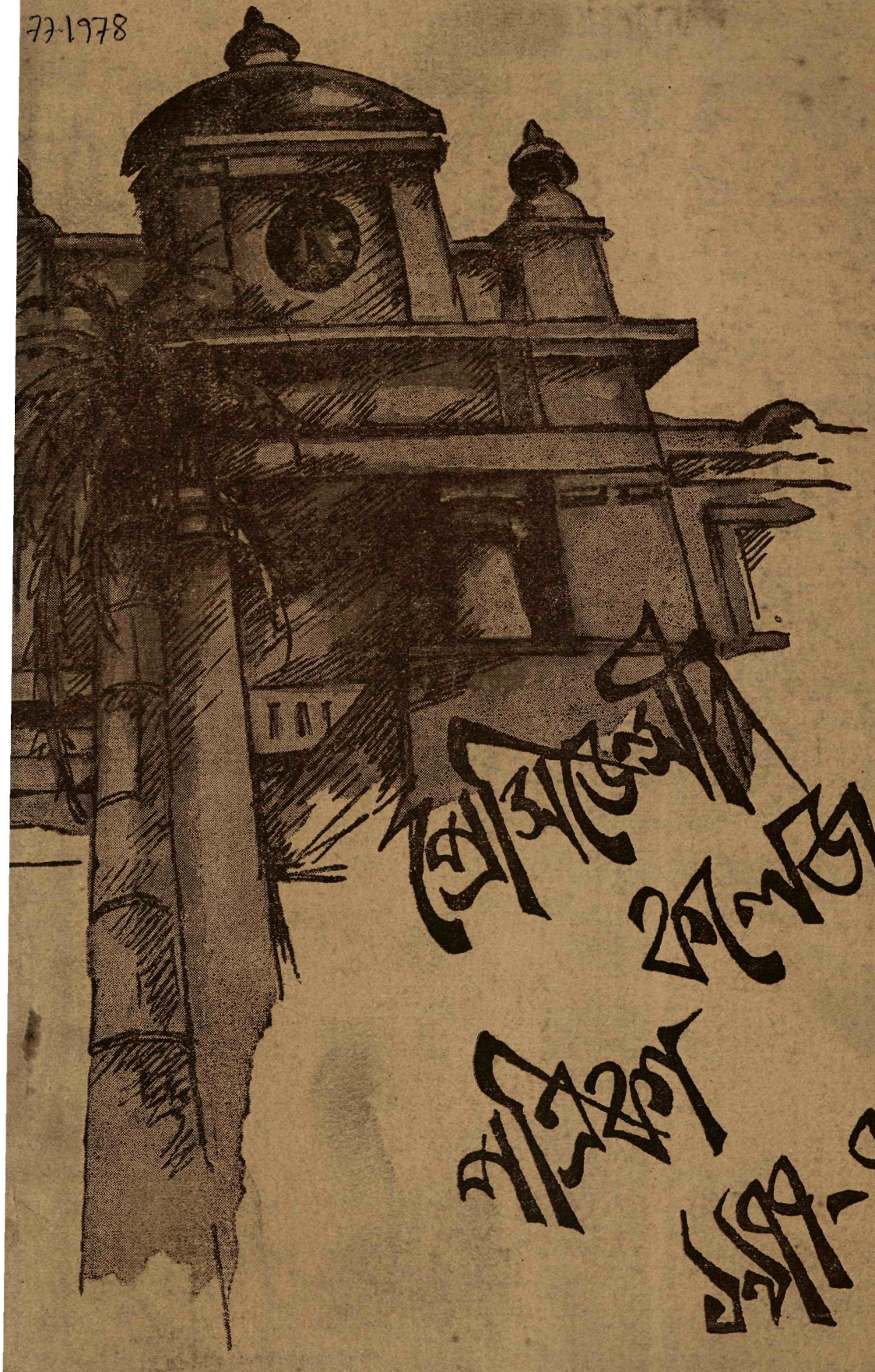

প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা ১৯৭৭-৭৮

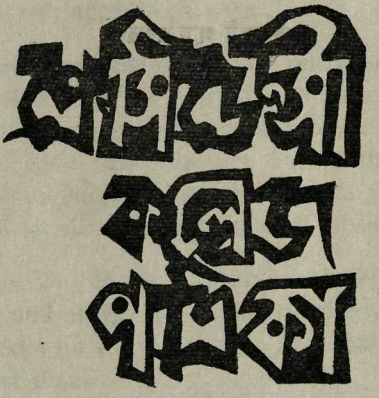

প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা

কর্মসচিব
পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
সুগত বসু
গৌতম বসু

পরিদর্শক
অধ্যাপক হীরেন চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট ও নামপত্র

তপতী গুহঠাকুরতা

অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩ থেকে মুদ্রিত।

Foreword

The *Presidency College Magazine* (1978) has come out late. For this there are several reasons, The sluggishness of the printers because of strike and load-shedding has been mainly responsible for the delay. Efforts at acceleration were hampered by one of the editors; he did not submit his editorial in time in spite of several reminders and thus withheld publication which was already lagging behind the normal time-schedule. We sincerely apologise for the delay.

The *Presidency College Magazine* has a distinctive character of its own and is not just a routine publication. Throughout its long and distinguished career it has received thought-provoking articles from past and present students. In keeping with that tradition this issue, too, contains a number of writings of a high standard and abiding interest. Some may be of a controversial nature, but these no doubt represent the honestly expressed opinions of the writers, although everyone need not agree with them.

I would like to draw the attention of all concerned to an important point. Because of the abnormal rise in the cost of publication and the limited funds at our disposal, it is, I fear, simply not possible to publish the Magazine every year. The cost for this issue has been met out of the last two years' funds. The Magazine will have to be published in alternate years unless the students' contribution to the fund is raised or government subsidy received.

Thanks are due to Dr. H. N. Chakraborty, Professor-in-charge of the Magazine, for the time and energy he has ungrudgingly devoted to this number. Students who have helped with the publication and contributors to the Magazine also deserve our sincerest thanks.

B. S. BASAK
Principal,
Presidency College,
Calcutta.

Foreword

The Presidency College Magazine (1978) has come out late. For this there are several reasons. The sluggishness of the printers because of strike and load-shedding has been mainly responsible for the delay. Efforts at acceleration were hampered by one of the editors; he did not submit his editorial in time in spite of several reminders and thus withheld publication which was already lagging behind the normal time-schedule. We sincerely apologise for the delay.

The Presidency College Magazine has a distinctive character of its own and is not just a routine publication. Throughout its long and distinguished career it has received thought-provoking articles from past and present students. In keeping with that tradition this issue, too, contains a number of writings of a high standard and abiding interest. Some may be of a controversial nature, but these no doubt represent the honestly expressed opinions of the writers, although everyone need not agree with them.

I would like to draw the attention of all concerned to an important point. Because of the abnormal rise in the cost of publication and the limited funds at our disposal, it is, I fear, simply not possible to publish the Magazine every year. The cost for this issue has been met out of the last two years' funds. The Magazine will have to be published in alternate years unless the students' contribution to the fund is raised or government subsidy received.

Thanks are due to Dr. H. N. Chakraborty, Professor-in-charge of the Magazine, for the time and energy he has unstintingly devoted to this number. Students who have helped with the publication and contributors to the Magazine also deserve our sincerest thanks.

B. S. BASAK
Principal,
Presidency College,
Calcutta.

সূ | চী | প | ত্র

অভিভাষণ	১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক স্টার্লিং	৭	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রসঙ্গঃ বিজ্ঞজনের উৎপীড়ন	১১	দীপেন্দু চক্রবর্তী
কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে	১৬	সুমন চট্টোপাধ্যায়
স্বস্তি নেই	২২	সুনীল চট্টোপাধ্যায়
স্মৃতিঃ চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন	২৪	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
মৃত বন্ধুর জন্য	২৫	শঙ্খ ঘোষ
যন্ত্রণা নেই	২৬	শৌভিক মজুমদার
আত্মঘাতী বনস্থলীর গান	২৭	সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়
কথা ছিল	২৯	মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায়
নবজন্ম	৩০	নন্দিনী বসু
পলাতক	৩৩	ভবানীপ্রসন্ন চক্রবর্তী
'মালিনী'ঃ পুনর্মূল্যায়ন	৩৭	তপোব্রত ঘোষ
টাইপরাইটারে প্রেমপত্র বনাম কমল মাহাতোর গান	৪৭	তথাগত চক্রবর্তী
প্রকাশনা-সচিবের কথা	৫২	পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয়	৫৪	গৌতম বসু

CONTENTS

The Story of a Street	1	Tapati Guha Thakurta
Two Poems	4	Asadul Iqbal Latif
Focus on Eurocommunism	5	Sujit Basu
Human Rights and the International Power Game	10	Rahul Choudhuri
A Middle-class Approach to Poverty : Pride and Prejudice	15	Sudipto Dasgupta
Albert Einstein	18	Amal Raychaudhuri
A Ball, a Ship, a Clock, ... and a Star	21	Sumit Ranjan Das
Conrad and Colonialism : *Heart of Darkness*	27	Supriya Choudhuri
Politics and Politicians	33	Faiyaz Ahmed
The Presidencians of Today : A Statistical Profile	35	
News from the Departments	40	
College News	49	Sugata Bose
Editorial	50	Sugata Bose

CONTENTS

The Story of a Street	1	Tapat Guha Thakurta
Two Poems	4	Arabul Iqbal Laiff
Poets on Eurocommunism	5	Sunil Basu
Human Rights and the		
Uncombdonal Power Game	10	Rahul Choudhuri
A Middle-class Upbringing		
Pride and Prejudice	15	Sudeep Dasgupta
Albert Einstein	18	Amal Ravichandran
A Ball, a Ship, a Clock, and a Star	21	Sunil Ranjan Das
Conrad and Economism		
Heart of Darkness	27	Sumita Choudhuri
Politics and Public-ness	33	Fairuz Ahmed
The Presidentiums of Today :		
A Statistical Profile	35	
News from the Department	40	
College News	40	Sabyasachi Basu
Editorial	50	Sugata Bose

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ
প্রেসিডেন্সি কলেজে

আজ থেকে অর্ধশতাব্দীরও আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্র-ইউনিয়নের আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে এসেছিলেন। সেদিন ছিল বুধবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সাল। বিকেল সাড়ে চারটেয় কবির পৌঁছনর কথা। নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই কলেজের ফিজিক্স থিয়েটার লোকে লোকারণ্য। চারটে বেজে চল্লিশ মিনিটে সমবেত দর্শকের করতালিধ্বনির মধ্যে কবি প্রবেশ করলেন। পরনে তাঁর রেশমী জোব্বা, অপূর্ব রাজকীয় চেহারা। প্রথমেই কবিকে ও কলেজ-অধ্যক্ষ মিঃ স্টেপ্লটন্‌কে মাল্যভূষিত করা হল। শ্রীসুশীল দে-র কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল। ইউনিয়ন-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে কবিকে স্বাগত জানালেন। তারপর, অধ্যক্ষ মহাশয় কবিকে ভাষণ দিতে আহ্বান করলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন।

অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তরুণের অভিনন্দন মনে শক্তি সঞ্চার করে, হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়। আজকের এই ছাত্রসভার অধিবেশনে আসা কতকটা সেই জন্যে। পাশ্চাত্যের যে সকল দেশে আমি গেছি, সেই সেই সকল জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক-ছাত্রদের প্রীতিলাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বহুদিন পূর্বে আমেরিকায় স্বাজাত্যাভিমান সম্বন্ধে আমার মত যখন ব্যক্ত করেছিলাম তখন সে সকল কথা সকলের প্রিয় হয় নি, অনেক বাদ প্রতিবাদ অনেক সংশয় সকলকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু উৎসাহ পেয়েছিলাম তরুণের কাছে। বস্টনে আমার

কোন একটা বক্তৃতা পাঠের পরে একটি ছাত্র এসে আমাকে বলেছিল "আপনার কথা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, আমাদের কর্তব্য কী বলে দিন।" গতবারে ইউরোপ ভ্রমণ করবার সময়ে বার্লিন, স্ট্রাসবুর্গ প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজের নিকট এইরূপ একটা প্রাণের সাড়া পেয়েছি। তখন আমার নিজের প্রাণের তরুণকে অনুভব করেছি, তা নইলে আমার কথা এদের আকর্ষণ করতে পারত না—এদের প্রাণের সুরে সুর মিলতে পারত না!

আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম তখন কলকাতায় ছাত্রসমাজের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মনে পড়ে তখনকার তরুণের দলের সঙ্গে আমার কাব্যরচনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনার কথা! মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটেছিল। তখন আমাদের দেশে একটা জরার হাওয়া যুবকদের চিত্তকে অধিকার করেছিল। যে সুর যৌবনের জয়গানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সে সুর অন্তরের বেদনায়, মৃত গৌরবের অনুভূতিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এটা একটা সাময়িক মোহ ছাড়া ত আর কিছু হতে পারে না। বাংলার দৃপ্ত তরুণ প্রাণ যে অনু-করণকে অস্বীকার করে এসেছে, জীবনের মাহাত্ম্য জীবনের স্বপ্রকাশ জ্যোতিকে আচ্ছন্ন হতে দেয় নি, এদেশের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে এই জিনিসটি সম্ভব হয় নি। উদাহরণস্বরূপ দেখ, মাদ্রাজের দিকে লক্ষ্য করে! যে অতীতকাল আর চলছে না সেই প্রাচীন অতীত সুপ্রত্যক্ষ হয়ে তাদের জীবনকে আবৃত করে রয়েছে, তারা প্রাচীনের ব্যবধান ভেদ করে দেখতে চাইছে না। আমার মনে পড়ছে মাদ্রাজের এক চেটি একটা মন্দির তৈরী করবার জন্যে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। সেই মন্দির তৈরী হল একেবারে অতি প্রাচীন দেব-মন্দিরের যথার্থ অনুকরণে। নতুন জিনিস ভাববার সাহস তাদের নেই, তারা সব পুরাতনের অন্ধকারে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছে।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত বাংলায় এমনটা হতে পারে নি। এই নদীমাতৃক দেশের পলি-মাটি প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন-গুলি ঢেকে ফেলে দিয়েছে। এখানে বৎসর বৎসর নিত্যনূতন ফসল ফলে যা কালের বিচারে জীবনের ক্ষেতে কোন রকম সার যোগায় না, তা বসুন্ধরার অন্ধকার ভাণ্ডারে পরিত্যক্ত ও নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। নবীনের জয় পতাকা নিয়ে যারা অগ্রসর হয়, তাদের পথ রোধ করব না, জীবনের কলস্রোতকে আবদ্ধ করব না—বাংলার মাটিই এই কথা বলছে! বাংলার নদী বয়ে চলেছে সাগরের পানে, জীবনের ভগ্নাবশেষগুলিকে ভেঙে চুরে ভাসিয়ে নিয়ে!

নূতনকে বরণ করে নেবার মত এই যে একটা সাহস নূতন ভাবকে গ্রহণ করবার এই যে একটা শক্তি, এতে করে হয়ত ক্ষতি হয়েছে কিন্তু ক্ষতির চেয়ে লাভ হয়েছে ঢের বেশী। যেখানে মানুষের বুদ্ধি ও তর্ক নূতনকে যাচাই করে নেবার চেষ্টা করে, সেখানে নূতনের স্রোতের মুখে বাধা পড়ে বটে, কিন্তু তাতে ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু যেখানে মানুষের অভ্যাসের জড়তা সজীব সত্যকে বাধা দেয় সেইখানেই মানুষের সবচেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য।

বাংলার তরুণ প্রাণকে জীবনের এই অন্ধ জড়ত্ব কখনও আড়ষ্ট করতে পারে নি। বাংলার ধর্মবিপ্লবের ইতিহাসে এই সত্যটা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে; বাংলার সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে এর আভাস আমরা পাই। এইখানে বৌদ্ধ ধর্ম একটা বিশেষ গৌড়ীয় ভাব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর একটা বিশেষ জিনিস এই সঙ্গে মনে পড়ে। ধর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কথা। বাংলাদেশ এই হিন্দুস্থানী গানকে আমল দিতে পারে নি—যে গান শেখবার জন্যে আমাদের ওস্তাদ আনতে নানারকম কসরৎ করতে হয়, সাধনা করতে হয়। কিন্তু সেটা আমরা গ্রহণ করতে পারি নি কারণ আমাদের জীবনের স্রোতের সঙ্গে সেটা মেলে না। বহুশতাব্দী পূর্বে আকবরের সভায় তানসেনের গান যেরকম করে সকলকে মুগ্ধ করেছিল, আমাদের ঠিক সেই রকম ভাবে মুগ্ধ করতে পারেনি। সঙ্গীতের কারুকার্য ও কলাকৌশল সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য আছে বটে এবং হিন্দুস্থানী গান শোনার মধ্যে আমরা সেই দৈন্য দৈনিক উপলব্ধি করি বটে কিন্তু বাংলা হিন্দুস্থানী গানের অনুকরণ করলো

না। বাংলার নিজস্ব সংগীত উচ্ছ্বসিত হলো—তার কীর্তনে। হিন্দুস্থানী সংগীতের তাল মান ও নানা-রূপ বাদ্যযন্ত্রগুলিকে বাংলা দেশ গতানুগতিকভাবে নিতে পারলে না। নানারকম তাল নানারকম নাম নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। তাদের সংগে ভদ্রতালের কোন সম্পর্কই রইল না। বাংলা দেশ খোল, পাক্‌ওয়াজের সৃষ্টি করলে, ওগুলোকে কেউ অসাধু বললে না। বাংলার জনসাধারণ সেই গানে মেতে গেল, নেচে কেঁদে হেসে লুটোপুটি খেলে। এটা কত বড় কথা। এমন ধারা অন্য কোন দেশে হয়নি। হাজার বছরের চিরাগত প্রথাকে বাংলা দেশ জায়গা ছেড়ে দিলে না, মানুষের সজীব চেষ্টাকে সার্থক করে তুললে। বাংলা সাহস করে বললে আমার গান আমি গাইব।

সাহিত্যেও এই একই জিনিস ধরা পড়ে। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে বাংলার বৈষ্ণবকাব্য আপনার নিজস্ব ধারা খুঁজে নিলে, অন্য কোনো প্রদেশের সাহিত্যে এমনটা ত চোখে পড়ে না। হিন্দী সাহিত্যের কাব্যকলাতেও গভীরতা আছে, নৈপুণ্য আছে, সেটা প্রথা ও নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণব কবি কোন প্রকার বাধা মানলেন না, প্রচলিত শব্দ ভেংগে চুরে, প্রচলিত ছন্দ অগ্রাহ্য করে বৈষ্ণব কবির ভাবধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। তাই বলছি বাংলাদেশ অন্য দেশের মূল্য-বান জিনিসকে যাচাই করে গ্রহণ করবে, কিন্তু তার অন্ধ অনুকরণ বাংলা করবে না। কিছুকাল ধরে একটা অন্ধ মোহের আওতায় হয়ত অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু বাংলায় সে জিনিস টিঁকবে না। বাহিরের জিনিসকে বাংলাদেশ তার জীবনের কলধ্বনির সংগে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করবে, নচেৎ সেসব কিছুতেই টিঁকবে না। আমাদের দেশে সৌখীন লোকেরা গোয়ালিয়র প্রভৃতি জায়গা থেকে গায়ক এদেশে আনিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সুর আমাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে স্থান পায় না। বাউল সে স্থান পেয়েছিল, কীর্তনে সারাদেশ ভেসে গিয়েছিল। এসব জানা কথা।

কিন্তু বাংলার যৌবন জরাসন্ধের পাষাণ কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছে। আজ যদি কোন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয় তাহলে সে পাথরের প্রাচীর ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যেদিন প্রাচীনের ভ্রূকুটী তোমাদের মুখে প্রকাশ পেল সেদিন থেকে তোমাদের সংগে মেলামেশা করতে আমার ভয় হতে লাগলো। আমার গান তোমাদের হৃদয়ে সাড়া পেল না। আমি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালাম। এখনো মনের কথা বলবার ভয় ঘোচে নি। সকল প্রকার reaction-এর মুখে, বিদ্রোহের মুখে নানারকম জিনিস ভেসে আসে। শুধু রাষ্ট্রীয় কারণ ছাড়া অন্য নানারূপ কারণও এ সকলের পেছনে কাজ করে। কিন্তু এ মোহটা সাময়িক—ওটা এখন কেটে এসেছে।

কিন্তু ভারতের কাছ থেকে জগতের অন্যান্য দেশ যা পাবার আশা করে তা বিশ্বজনীন একটা কিছু। চীনে ও জাপানে যে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম তার মূলে এই জিনিসটা রয়েছে। মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যেটা লাভ করবার জন্য উকীল নিযুক্ত করতে হয় না। তার মধ্যে বলপূর্বক অধিকার করা নেই, লাভলোকসান কোন কিছু নেই। কিন্তু এ কথা শুনে আমার দেশের অনেকে একটা ক্রূর হাসি হেসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ইনি বিশ্ব নিয়েই আছেন; ক্রমে "বিশ্ব" শব্দটা উচ্চারণ করা আমার দায় হয়ে উঠেছে। তারপর "উপনিষদ" ও "ভুমা" এ দুটি কথাও ব্যবহার করা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশ্বের জায়গায় যদি বলি Humanity, ভুমার জায়গায় যদি বলি Infinite তা হলে ত লোকে হাসে না। আজ যদি উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এদেশে আসতেন তাহলে কীরূপ আদর পাবেন সে বেশ বোঝা যায়।

আজ যে আমি বিদেশ যাচ্ছি সেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় দৈন্যের ফটোগ্রাফ করিয়ে তাদের সহানুভূতি অর্জন করবার জন্য নয়, আমাদের দেশের লোকের পিঠে কটা হাড় বেরিয়েছে, কটা চাবুকের দাগ বসে গেছে তা বলবার জন্য নয়। দারুণ দীনতার দিনে মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য সব চেয়ে বড় করে দেখা যায়। জগতের এই দুর্দিনে ভারত তার এই ঐশ্বর্য জগতের সামনে তুলে ধরবে। ভারত এক অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী।

ভারতের যা বলবার আছে সেটা সত্য ও চিরন্তন, তার সঙ্গে সকল দেশের, সকল মানুষের একটা যোগ আছে এবং সেইজন্যই চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে আমার মুখে ভারতের বাণী শুনে সকলে আনন্দলাভ করেছে। এই সঙ্গে সুইডেনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আপনারা জানেন সুইডেনের লোকেরা খুব aristocratic. ঐ দেশের একজন লোক আমায় বলেছিলেন—"আমরা সকলে বিদেশী বড় লোকের প্রতি হে চৈ করে সম্মান প্রদর্শন করি না। তোমাকে যে একটা বিশেষ সম্বর্ধনা করেছি, এইটে বিশেষ ভাবে মনে করে নিয়ে যেও।" আমি বললাম—"আমি কী লিখেছি না লিখেছি, তা ত তোমরা কেউই জান না; যা লিখেছি তা বাংলায় লিখেছি এবং আমার দেশের লোকের কাছে আমার লেখার মূল্য নিরূপণ করতে গেলে যে একটা সদুত্তর পাবে তা নয়।" কিন্তু আসল কথা এই যে, সেখানে আমি নিজের কথা বলি নি। ভারতের চিরন্তন সত্যের বাণী আমি তাঁদের শোনাবার চেষ্টা করেছিলেম।

যে মানুষ সকলকে আপনার মত জানে, সে সত্যকে জানে—স পশ্যতি। এটা একটা sentiment নয় ভাবুকতা নয়। এটা জ্ঞানের কথা, বুদ্ধির কথা। মানুষের সত্য কোথায়, তাকে সত্যরূপে দেখব কোথায়?—যেখানে সকলের সঙ্গে তার একান্ত আন্তরিক ঐক্য আছে। এই ঐক্যের কথা খুব জোরের সঙ্গে আমাদের ভারতই বলেছে।

এই সত্যের অপলাপে পৃথিবীতে বিরোধ বিপ্লব উঠেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে যেখানে বাধা পড়েছে সেইখানেই বিদ্রোহ। আজকের দিনে পাশ্চাত্যে সকল দুর্দশার একমাত্র কারণ—শান্তির অভাব। সমস্ত জাত পাশাপাশি দাঁড়াল, এইটাই ঐতিহাসিক তথ্য; কিন্তু অন্তরের সাড়া পেল না, সত্য পাওয়া গেল না—সকলেই চেষ্টা করলে কে কাকে দাসত্বে জর্জর করে তুলবে, কে কাকে ঠকাবে, ফাঁকি দেবে। সারা বিশ্ব অশান্তিতে ভরে গেল। এই উৎকট patriotism বা nationalism বিধাতা কখনই জয়যুক্ত করতে পারেন না। সত্যের অপলাপ হতে দেবেন না তিনি। মানুষের সহিত মানুষের যে সত্য সম্বন্ধ সে সত্য সম্বন্ধকে স্বীকার করবার জন্য মানুষ আদিম কাল থেকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। যেখানে সে সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়নি সেখানে লোভ, ক্রোধ, অবজ্ঞা, অবমাননা—সেখানে দুর্গতির সীমা নেই।

ভারতে অনেক বিভিন্ন জাতি এসে মিলেছে, কী করে তারা সব ঐক্যলাভ করবে সেইটাই ভারতের সাধনা। আর যতক্ষণ না এই ঐক্য লাভ করতে পারবে ততক্ষণ কোন চেষ্টাই সফল হবে না। এই ঐক্যের সম্বন্ধ শুধু প্রয়োজনের সম্বন্ধ হলে তা টিঁকবে না, সেটা সত্য সম্বন্ধ হওয়া চাই।

আমাদের জাতীয় দুর্দশার মূলে রয়েছে এই সত্য সম্বন্ধের অভাব। মালয় দ্বীপে দেখছি সেইখানকার ভারতীয় মাদ্রাজী কুলী কিরূপ দুর্দশার মধ্যে পড়ে রয়েছে। তারা পুরুষানুক্রমে কুলিবৃত্তি করছে, তাদের অপমানের অন্ত নেই। এর কারণ তাদের মধ্যে কোন সত্য ঐক্য নেই। কুলীর সর্দারগণই স্বদেশবাসীর রক্ত শুষে নিচ্ছে। তারা যে ৭০/৮০ সেণ্ট পায় তা থেকে কুলীর সর্দার অধিকাংশই শোষণ করে নেয়। উদ্বৃত্ত যা কিছু থাকে তাতে তাদের সন্তানগণ শিক্ষা লাভ করতে পারে না, শুধু কায়ক্লেশে বেঁচে থাকে। কাজে-কাজেই চিরকাল কুলীবৃত্তি করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু ক্যান্টন থেকে যে-সমস্ত চীনে কুলী সেখানে কাজ করতে যায় তাদের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য আছে। তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তাতে তাদের আত্মসম্মান বজায় থাকে, এবং আর্থিক লাভও যথেষ্ট হয়। সকলে বলে থাকেন, আমাদের দেশ দরিদ্র, পীড়িত, জীবনীশক্তিহীন—তার কারণ অনেকে বলেন যে আমাদের জমির উর্বরতা কমে গেছে, আমাদের দেশ ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, পল্লীর জল সরবরাহের কোন বন্দোবস্ত নেই, কিন্তু কেউ বলেন না যে আমাদের মধ্যে একটা দারুণ অনৈক্য এই সকল দুর্দশার একমাত্র কারণ। আমি জানি যখন বোলপুরের এপারে আগুন লেগেছিল, তখন ওপারের লোকেরা নিজেদের ঘড়া সামলাচ্ছিল পাছে তাদের ঘড়া নিয়ে অপরে আগুন নেবাবার জন্য জল দেয়। এত-

দূর বিচ্ছেদ! আমাদের দেশের লোক সম্মিলিত হয়ে দুঃখ দূর করতে পারে না। আর একটা ঘটনার কথা বলি। একবার আমরাই একটা রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিলাম, বর্ষার সময় দু-হাত রাস্তা ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমরা নিকটবর্তী গ্রামের লোকেদের বললাম "তোমরা হাত লাগিয়ে ওই একটুখানি জায়গা সেরে নাও"। উত্তরে তারা বললে, "তা আমরা পারব না। আমরা রাস্তা সারিয়ে দেবো, আর কুণ্ঠের লোকেরা ওর উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাবে।" তারপর একটা আত্মসম্মানের অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ধরুন লর্ড কিচেনারের মত একজন বীরপুরুষ আমাদের দেশে জন্মেছেন। একমাত্র আমাদের দেশেই এটা সম্ভব হয় যে, অত বড় লোকের সম্বন্ধে কোন অপমানকর কথা বলতে লোক সাহস করে এবং সে কথা শুনে লোক খুসী হয়। সম্ভব অসম্ভবের কথা ভাবে না, তাঁর কার্যকলাপ ও কীর্তির কথা নিমেষে ভুলে যায়। আত্মসম্মানের কতবড় অভাব। ইংলণ্ডে এরকম কথা যদি কেউ মুখে আনে, লোকে ছিঁড়ে ফেলবে। এরকম হয় কেন? এর কারণ, যে প্রীতির উপর মানুষের ঐক্য নির্ভর করে সেই প্রীতির অভাব। মানুষের প্রতি মানুষের প্রাণের টান তো দূরের কথা, জ্ঞান-বুদ্ধির যে সম্বন্ধ তাও সত্য হয় না!

ইউরোপের সাহিত্যের মস্ত একটা শিক্ষা এই যে, তার মধ্যে সমস্ত মানবের ঐক্য খোঁজবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণ জগতের কত সভ্য অসভ্য জাতির ভাষা নিয়ে সমস্ত জীবন ব্যয় করে ফেলছেন। মানুষের জানবার যে একটা কৌতূহল সেটা সফল করে তোলবার জন্য তাঁরা সাধনা করছেন। জ্ঞানের দিক দিয়ে এ-বিষয়ে অপূর্ব লাভ করছেন তাঁরা! একদিন ইউরোপের লোকে আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরা জেনেছেন তাদের সঙ্গে নিজেদের কি এক মর্মগত নাড়ীর সম্বন্ধ রয়েছে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ঐক্য সেটা ধরা দিয়েছে মানুষের ভাষার ঐক্যের মধ্যে। বিভিন্ন দেশের রূপকথার মধ্যে তার পরিচয় পাই। যে primitive artist গুহার ভিতর ঘোড়া, গণ্ডার হরিণের ছবি এঁকেছিল, সেই artist-এর সঙ্গে যে আজকালকার কলাবিদের হৃদয়ের ও জ্ঞানের যোগ আছে, সেটাও অনুভব করা যায়। এইখানেই "ভুমা" কথাটা ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা বলব না। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের যে একটা বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে, জ্ঞানের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সেটাকে লাভ করেছে। ওদের পায়ের কাছে বসে সেটা আমাদের শিখতে হবে।

যারা এই ঐক্যকে স্বীকার করে নিয়েছে তারাই জ্ঞানেতে, অর্থেতে সত্যকে পেয়েছে। আর যারা বলছে আমরা বিধাতার বিশিষ্ট সৃষ্টি, আমাদেরই সৃজনে ব্রহ্মা তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ করে দিয়েছেন—অন্য সকলে ম্লেচ্ছ—তারাই সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। যারা সত্যকে প্রাচীর তুলে ভাগ করে দেবার চেষ্টা করেছে, যারা বলেছে আমাদের জন্ম অন্যত্র অতএব তোমরা আমাদের সঙ্গে মিলতে পারবে না, তোমরা তোমাদের পথে চল, আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোনও যোগ থাকতে পারে না, তারাই মরেছে! আমাদের দুর্গতির মূলে রয়েছে এই উৎকট ভেদবুদ্ধি—সমাজে, রাষ্ট্রে, সর্বত্রই আত্ম এবং পর এই বোধটাকেই আমরা উগ্র করে তুলেছি। যতক্ষণ না আমরা এই ঐক্যকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারব ততক্ষণ আমাদের দুর্গতি যাবে না এইটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বক্তৃতা শেষে মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ কবিকে অভিনন্দিত করলেন। 'জনগণমন-অধিনায়ক' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা সওয়া ছ'টা নাগাদ সেদিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথের আগমন সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার পুরনো সংখ্যা থেকেঃ Binayaka Banerjee, "Rabindranath in Presidency College," *The Presidency College Magazine*, Vol. XI, No. 1, Sept. 1924, pp. 65-67; S. C R. (Suresh Chandra Ray), "Reports," *The Presidency College Magazine*, Vol XI, No. 2, Dec. 1924, pp. 169-70.

—সুগত বসু

১৯২৪-এর সেপ্টেম্বরে বিদেশযাত্রার কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়ন-কর্তৃক আয়োজিত অভিনন্দন-সভায় রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতার অনুলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সংহতি' কাগজে, ভাদ্র ১৩৩১; ঐ বছরের ১৫ই আশ্বিনের 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। বিস্মৃত 'আত্মশক্তি' থেকে একে উদ্ধার করেছেন সুগত বসু, এ বছরের কলেজ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। অন্য সব কিছু অবিকল রেখে উদ্ধৃত এই অভিভাষণের বানানমাত্র আধুনিক করা হলো।

এই অভিভাষণের সামান্য একাংশ পরে ছাপা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'সংগীত' নামক গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০৪—৫।

রবীন্দ্রনাথের গন্তব্য ছিল পেরু; উপলক্ষ্য সেখানকার স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসব। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার বুয়েন্স্ এয়ারিস্-এ শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া (বিজয়া) ওকাম্পোর আশ্রয় নিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই অসমাপ্ত বিদেশযাত্রার ফল 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ও 'পূরবী'।

—হীরেন চক্রবর্তী

অধ্যাপক স্টর্লিং

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এখন যারা পড়ছে তাদের হয়তো বুঝতে একটু সময় লাগবে, কিন্তু প্রাক্তন ছাত্র আমরা সবাই জানি প্রেসিডেন্সি কলেজের মায়া কাটানো কত কঠিন। তাই কলেজ পত্রিকার তরফ থেকে লেখার আহ্বান পেয়ে খুশী হয়েছি—আর বিশেষ করে খুশী হয়েছি এজন্য যে পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মহাশয় চেয়েছেন অধ্যাপক স্টর্লিং সম্বন্ধে একটি লেখা। একেবারে বিদেশী হয়েও আমাদের এই কলেজের মায়ায় অধ্যাপক স্টর্লিং-ও যে বাঁধা পড়েছিলেন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ মিলল যখন জানা গেল যে, মৃত্যুর পর সম্পত্তির একাংশ তিনি দান করে গেছেন কলেজকে। আজকের ছাত্র-অধ্যাপক সকলের কাছে সম্পূর্ণ বিস্মৃত এক বিদেশীর এই বদান্যতা প্রায় একটা বিস্ময়কর ঘটনা—বিশেষ করে বর্তমানের পরিস্থিতিতে, যখন সম্ভবত বিদ্যায়তন বিষয়ে আবেগ বলে একটা বস্তু বড়ো একটা দেখা যায় না। স্টর্লিং সাহেবকে খুব একটা কল্পনা-প্রবণ ব্যক্তি বলে কেউ আমরা মনে করতাম না। কিন্তু তিনিই দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে স্বদেশ থেকে বহু-দূরাবস্থিত এই বিদ্যাপীঠ তাঁর মনের আকাশকে অনেকটা ভরে রেখেছিল। ১৯২৭ সালে যে কলেজ ছেড়ে যান সেই কলেজের কল্যাণকল্পে সত্তরের দশকে মৃত্যুকালে তিনি সঞ্চিত সম্পদের কিয়দংশ সমর্পণ করে গেলেন। এ-ধরনের সামান্য কিন্তু অর্থবহ ঘটনার জোরেই বোধ হয় মানুষের ওপর আস্থা বজায় রাখা সহজ হয়।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের মধ্যে এখন কেমন যেন বিকৃতি এসে গেছে। পরস্পরের মধ্যে যে যোগসূত্র স্বাভাবিক মনে হয় তা যেন প্রায় ছিন্ন, দুই পুরুষ-এর মধ্যে রয়েছে বিপুল ব্যবধান। অনেক সময় অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই ধারণাকে সমর্থন দেয় না, কিন্তু কথাটি বহুল-প্রচলিত এবং মাঝে মাঝে এমন ঘটনারও খবর আসে যা থেকে মনে হয় যে, এ-ব্যাপারে অস্বস্তির কারণ যথেষ্ট আছে। যাই হোক, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের প্রতি মমতা অধ্যাপক স্টর্লিং জীবনের শেষ পর্যন্ত অনুভব করে গেছেন। নইলে ছাত্র কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের হিসাবে বেশ মোটা টাকা এই কলেজকে দেবার নির্দেশ রেখে যেতেন না। আমার মতো দু'একজন ছাত্রকেও তিনি এভাবে স্মরণ করে গেছেন—যদিও তাঁর স্নেহ সম্বন্ধে নিজেরাই অচেতন থেকেছি। বহু বৎসর ধরে প্রায় কোনো সম্পর্কই তাঁর সঙ্গে রাখি নি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কালে (১৯২২-২৮) অধ্যাপক-মণ্ডলীতে 'সাহেব'—একেবারে আনকোরা শ্বেতাঙ্গ সাহেব—কয়েকজন ছিলেন, যাঁদের অন্যতম ইংরেজির অধ্যাপক টি· এস· স্টর্লিং। অধ্যক্ষ প্রথম দিকে ছিলেন জে· আর· ব্যারো, যাঁর সম্বন্ধে ছাত্রমহলে একটা ভীতির ভাব ছিল। যদিও মানুষ হিসাবে হয় তো তিনি একেবারেই খারাপ ছিলেন না, তবে আমাদের স্বদেশী কানে ব্যারো সাহেবের ইংরেজি

সহজে বোধগম্য হত না বলে পালিয়ে বেড়ানোটাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হত। ইংরেজি বিভাগে ছিলেন জে· ডব্লু· হোম্ সাহেব, যাঁর কাছে আমি কখনও পড়িনি। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় তখনকার অধ্যক্ষ স্টেপ্‌ল্‌টন-এর খেয়াল-মাফিক টিউটোরিয়াল কিছু-কাল করিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যারিসন্ সাহেব, যাঁর সঙ্গে কিছুটা বাৎচিৎ করে ইংরেজি ঝালিয়ে নেবার একটু সুযোগ হয়তো হয়েছিল। খাস ইংরেজি অধ্যাপক শুধু স্টর্লিং সাহেবেরই ক্লাসে আমরা একেবারে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে মোটামুটি জড়োসড়ো অবস্থায় কয়েক মাস পড়েছিলাম। ব্যক্তি-গতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার বেশি যোগাযোগ ঘটে অনেক-দিন বাদে, যখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা একটু বেশি জ্বল্‌জ্বলে হওয়ায় বন্ধুরা ঠেলেঠুলে একেবারে অনিচ্ছুক আমাকে বানিয়েছিল কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি। এবং স্টর্লিং সাহেব তখন অধ্যক্ষ এবং ইউনিয়নের সভাপতি। ১৯২৭-২৮ সালেই আঠারো বছর কাজের পর এবং তখনও অবসরের বয়স না হলেও, স্টর্লিং দেশে চলে যান—নিজে বিয়ে-থা করেন নি, সম্ভবত বৃদ্ধা মা-কে একা না রাখার জন্যই চলে যান। এটা আন্দাজ করছি, কারণ স্টর্লিং-এর কাছে তার মার কথা তখন এবং পরেও কিছু শুনেছি। মাতৃভক্ত ছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আমাদের অধ্যাপকদের মধ্যে তখন বেশ কয়েকজন ছিলেন যাঁদের দিক্‌পাল বললে একটুও বাড়াবাড়ি করা হয় না। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কুরুভিলা জ্যাকারিয়া—নাম উল্লেখ করে যাওয়ার দরকার নেই। আর তখনকার শিক্ষকদের বলতে গেলে তো কথা শেষ করা যাবে না। সুতরাং সেদিকে না গিয়ে স্টর্লিং সাহেব সম্বন্ধেই কয়েকটা কথা বলা ভালো। আমি নিজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম না কখনও, তাই জোর করে কিছু বলা উচিত হবে না—তবু এটা হয় তো ঠিক যে স্টর্লিং কলেজে অধ্যাপকরূপে যে দারুণ খ্যাতিমান ছিলেন তা বলা যায় না। আমরা ঢুকেই কিছুকাল তাঁর ক্লাশ করে কিন্তু কিছুটা আনন্দ পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল সাহেব আমুদে লোক, দেখলাম এক নম্বর ঘরের বিরাট জানলায় হঠাৎ একটা কাক এসে চিৎকার শুরু করায় অধ্যাপক মহাশয় টেবিলের খড়িটি দু'টুকরো করে একের-পর-আর ছুঁড়ে কাকটাকে তাড়ালেন এবং সবাই আমরা 'হো হো' করে হাস্‌লাম। তিনি পড়াতেন 'বাইব্‌ল্' থেকে সংকলন, 'Sermon on the Mount' বিষয়ে তাঁর পড়া এবং ব্যাখ্যা শুনলাম—বেশ মনে আছে একবার যখন পড়াচ্ছিলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট একদল জেলেকে মাছ ধরতে দেখে বললেন তোমরা কাজ ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এসো আর তারা যীশুর সঙ্গ নিল, সঙ্গে সঙ্গে স্টর্লিং আমাদের বোঝালেন যে, মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রেও দেখা যাবে ব্যক্তিত্বের এমনি মাদকতা, তাঁর ডাক শুনে অনেকে সর্বস্ব ছেড়ে দেশের কাজে নেমেছে! একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম সাহেবের মুখে একথা শুনে, কারণ এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো সহানুভূতি প্রত্যাশা করি নি এবং যতদূর জানি স্টর্লিং সাধারণ ভদ্র ইংরেজের মতো সাম্রাজ্য ব্যাপারে ব্রিটিশের উৎকর্ষ এবং ভারতীয়-দের দুর্বলতা বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন। রাজনীতি ব্যাপারে আগ্রহ হয় তো একেবারে ছিল না আর থাকলেও একটু-আধটু 'লিবারল্' মনোভাবের ঊর্ধে তা উঠতো না। এ সত্ত্বেও গান্ধী সম্বন্ধে স্টর্লিং-এর কথাগুলো বেশ মনে আছে—বিশেষত এ কারণে যে, তখন আমি ছিলাম বেজায় গান্ধীভক্ত, কলেজের খাতায় 'নোট' না লিখে লিখতাম গান্ধীর নানা উক্তি যা মুখস্থ ছিল। (এখনও কিছু কিছু আছে!)

কলেজ জীবনের একেবারে প্রথম দিকে স্টর্লিং-এর ক্লাশে একটা মজার ব্যাপার ঘটল। ক্লাশ শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় ইস্কুলের কায়দায় সবাই দাঁড়িয়ে বেরোবার রাস্তার দিকে ঠেলে যাবার ভাব দেখাতে অধ্যাপক মহাশয় সজোরে হাঁক-ডাক দিয়ে উঠলেন, অঙ্গভঙ্গী করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, বুঝি ভয়ঙ্কর অঘটন একটা কিছু ঘটেছে বলে সবাই উত্তেজিত এবং স্বয়ং সাহেব-অধ্যাপককে এমন চেহারায় দেখে সবাই যখন একটু থম্‌কে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন হেসে বললেনঃ 'তোমরা কে এখুনি ছুটে ট্যাক্সি

ধরতে চাইছ, বল তো আগে? নইলে এ হৈ-চৈ কেন'? —এমন ভাবে বললেন যে হাসির আড়ালে অপ্রসন্নতা অদৃশ্য হয়ে গেল, সবাই বুঝল অধ্যাপক শৃঙ্খলা চান তো বটেই, কিন্তু তা নিয়ে জবরদস্তি পছন্দ করেন না।

কলেজ ইউনিয়ন-এর কাজে স্টর্লিং সাহেবকে খুব কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম—কি জানি কেন, আমার ওপর তাঁর কিছুটা স্নেহের ভাবও লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম। হয় তো পরীক্ষায় আমার কৃতিত্ব খানিকটা আকৃষ্ট করেছিল। তখন ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ (পরে কলেজ প্রিন্সিপাল) মনীষী অধ্যাপক ভূপতিমোহন সেন কিংবা ছাত্রদরদী অধ্যাপক সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার-এর মতো সহকর্মীদের কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে ভাল কথা শুনে সাহেবের মন এমনিই ভিজে এসেছিল। কোনো-কালে ইংরিজি 'মিডিয়াম' স্কুলে না গিয়েও ইংরিজি উচ্চারণটা কিছু পরিমাণে সরেশ হওয়ায় হয়তো বা সাহেব একটু খুশীও হয়েছিলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে, বিতর্কে আমার একটু কৃতিত্ব আছে, আর স্টর্লিং সাহেব উঠে পড়ে লাগলেন যাতে ইউনিয়ন 'ডিবেট'-এর খবর তখনকার সাহেবী কাগজগুলোয় বেরোয়, চেষ্টাও করলেন, তেমন সুবিধা হল না। ইউনিয়নের উদ্যোগে শারদোৎসব যখন হলো ইউ-নিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট্‌ হলে, স্টর্লিং এলেন একদল সাহেব-মেম বন্ধু নিয়ে। অকৃতদার পুরুষ, থাকতেন চৌরঙ্গীর ওপর ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাব-এ। বন্ধুরা সবাই সে-সন্ধ্যাটা বোধ হয় কাটালেন একটু হৈ-হৈ করে, ভূমিকা হলো কয়েকটা বাংলা গান শোনা আর 'বিসর্জন' নাটকের একটু অভিনয় দেখা। সে-অভিনয়ে ছিলেন প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি। রানীর সাজ ছিল চমৎকার, একেবারে খাঁটি সোনার চমকপ্রদ গহনা (ঠাকুরবাড়ী থেকে ধার করা) দেখে মেমসাহেবদের যুগপৎ হর্ষ ও ঈর্ষা লক্ষ্য করে স্টর্লিং পুলকিত, সাজঘরে গিয়ে দারুণ খুশী। ডাক-সাইটে কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েও স্টর্লিং-এর ব্যবহারে কোনো দূরত্বের আতিশয্য থাকত না। কেম্ব্রিজ (যেখানকার ডিগ্রী ছিল তাঁর) আর কলকাতার শিক্ষাজীবনে তফাৎ অনেক—কিন্তু কিছু পরিমাণে প্রেসিডেন্সি কলেজকে আত্মীয় করে নিতে পেরেছিলেন স্টর্লিং। এ-কলেজ বিষয়ে একটা অহংকারও পোষণ করতেন, চাইতেন আমরাও *alma mater* নিয়ে গর্ব করি, বলতেন কখনও 'the' বসিয়ো না কলেজের নামের আগে, 'Presidency College' হল যথেষ্ট।

যখন অবসরকাল আসার বহু পূর্বে বিদায় নিলেন তখন ছাত্রদের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান হলো তা প্রকৃতই মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। বিদায়ী অভিভাষণপত্রের প্রশংসায় শতমুখ হয়েছিলেন। পরে বলতেন তাঁর মা সেটি পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছেন, যত্ন করে দেশের বাড়ীতে সেটি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। বহুদিন পরে অন্য বন্ধুর মুখে শুনেছি জানতে চাইতেন কে বা কারা রচনা করেছিল সেই বিদায়পত্রটি—কলেজ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক হুমায়ুন কবির কিংবা কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক হীরেন মুখার্জি কিংবা কলেজ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কিংবা সবাই মিলে, কিংবা কীভাবে?

আমি নিজে প্রায় পাঁচ বৎসর ইংলণ্ডে থাকার সময় কিন্তু একবারও স্টর্লিং সাহেবের খোঁজ নিয়ে দেখা করতে যাইনি। পরে ভেবেছি এটা আমার অপরাধ—তিনি আমাকে স্নেহ করতেন সন্দেহ নেই, এমন একটি দারুণ সার্টিফিকেট আমাকে দেন যা দেখে কলেজের বড়োবাবু আমাকে বলেন যে, এরকমটি তো তাঁর অভিজ্ঞতায় কখনও দেখেন নি! কিন্তু থাকতাম অক্সফোর্ডে, কালেভদ্রে লণ্ডনে আসতাম, ছুটিতে যেতাম ইউরোপের অন্যত্র (একবার লম্বা ছুটিতে দেশেও গিয়েছিলাম)। তাই খবর নিয়ে কোথায় থাকেন জানার এবং তারপর যাওয়ার মেহনৎ কখনও স্বীকার করি নি। অনেক পরে আমি যখন পার্লামেণ্টের সদস্য, আমার সহপাঠী বন্ধু সুকুমার ভট্টাচার্যের কাছ থেকে স্টর্লিং সাহেবের খবর পাই। তিনি চিঠি লেখেন কয়েকবার, জবাব দিই। জানতে পারি তিনি বোধ হয় Poetry Society কিংবা ঐরকম একটা কোনো সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। লণ্ডনের একটা নামজাদা ক্লাবেও নিয়মিত আস্তানা। চিঠির মারফৎ আবিষ্কার করলাম তাঁর মনের একটু খবর—আমি 'এম-পি' হওয়ায় সুখী,

কিন্তু রাজনীতি ব্যাপারে প্রায়-সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ঢাকবার কোনো চেষ্টা নেই, আমার সাম্যবাদী প্রত্যয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই (যা জেগেছিল আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার মনে)। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ব্যাপারে একটা বাক্য চিঠিতে ব্যবহার করে দেখলাম যে, তিনি ঠিক বুঝলেন না—১৯৫২/৫৩ সালে ইংলণ্ডে যে মার্কিন মুলুকের "McCarthyism" এবং "100 percent Americanism" ধরনের বস্তু দেখা দেয় নি। কথাটার অর্থ না ধরতে পেরে কোন সভায় কী বলেছেন তার খবরও একবার লিখলেন আমাকে। বুঝলাম স্টর্লিং সাহেবের মনটা পড়ে আছে পুরনো যুগে, ক্লাবে মামুলী সব বনেদী কাগজপত্র একটু চোখ বুলিয়ে দেখেন শুধু। তবে প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ মানসিকতার গণ্ডীতেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। কয়েকবার লিখলেন চোখে অপারেশন করে তেমন সুবিধা হচ্ছে না, পড়া-শুনায় বাধা পড়ছে ইত্যাদি ঘরোয়া খবর—ঘর ছেড়ে বাইরে যে জগৎ তার সঙ্গে যোগাযোগ তেমন ছিল মনে হয় না।

কত বড় ভুল এটা বুঝলাম যখন জানা গেল তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং ইচ্ছাপত্রে কলেজকে মোটা টাকা দিয়ে গেছেন। ছাত্রদের কথাও শেষ পর্যন্ত তাঁর স্মরণে ছিল। ভাবতাম বুঝি যে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তেমনি এই ইংরাজটিও ছিলেন দ্বীপমণ্ডুক মন নিয়ে—জানতাম না যে ভারতবর্ষ এবং সেখানকার যে বিদ্যায়তনে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটিয়েছেন তার সঙ্গে যোগসূত্র শেষদিন পর্যন্ত ছিন্ন হতে তিনি দেন নি। চরিত্রের কোথায় যেন একটা বিরাট দার্ঢ্য তাঁর ছিল, নইলে এমনটি ঘটতে পারে না। আর দেশে-দেশে, পুরুষে-পুরুষে যখন ব্যবধানের কথাই প্রকট হয়ে ওঠে তখন এই সাধারণ বিদেশী সুজনের ভারতবর্ষ বিষয়ে মমতা মুগ্ধ না করে পারে না।

বিলম্বে হলেও ভরসা করি প্রেসিডেন্সি কলেজ এই প্রাক্তন শিক্ষকের স্মৃতিতে যথাবিহিত মর্যাদা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হবে না।

টি· এস্· স্টর্লিং, এম্· এ· (ক্যান্টাব্), ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৬-২৭ সালে তিনি ছিলেন কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ। এই কলেজের প্রতি তাঁর অন্তরের টান ছিল, তাই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা ভুলতে পারেন নি। ১৯৩৯ সালের **প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার** রজত জয়ন্তী সংখ্যায় 'A College Association and a College Hall' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক স্টর্লিং আমাদের সামনে এই কলেজ সম্পর্কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত করেন—"two matters which, in my opinion, vitally concern the future well-being of the College we all hold dear. The first is the formation of a Presidency College Association, membership of which would be open....to all past and present professors and students....The other matter....is that old outstanding question of a College Hall.... Some day....I hope once more to visit Presidency College, to renew my acquaintance with my old colleagues and students...I look formard to the day when I shall once more visit the scene of so many happy memories. When that day comes I hope that as a member of Presidency College Association I shall sit in Presidency College Hall." অধ্যাপক স্টর্লিং প্রেসিডেন্সি কলেজকে নিয়ে যেসব স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার কিছু কিছু পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

১৯৭৩ সালে আমাদের কাছে খবর আসে যে, অধ্যাপক স্টর্লিং তিন লক্ষেরও বেশি টাকা প্রেসিডেন্সি কলেজের অভাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উইল করে রেখে গেছেন। এই তহবিল থেকে এখন প্রতি বছর তিরিশজন ছাত্র-ছাত্রীকে মাসিক চল্লিশ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়।

—স· ব·

[তথ্যঃ অধ্যাপক হীরেন চক্রবর্তীর সৌজন্যে]

প্রসঙ্গ ঃ বিজ্ঞজনের উৎপীড়ন

দীপেন্দু চক্রবর্তী

I hate any kind of tyranny, whether of words or deeds.

—Montaigne

"যাঁহারা অধিক লেখাপড়া জানেন, তাঁহারা প্রায়ই শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠেন। ইংলণ্ডের বর্তমান প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিরাই ইহার প্রমাণ। অধিক লেখাপড়া শিখিলে জগতের অনিষ্ট হয়, এটা সিদ্ধান্তবাক্য হইলে ইংলণ্ডে এতদিন লেখাপড়া চর্চা বন্ধ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। অধিক লেখাপড়া শিখিলে লোক যে শান্তিপ্রিয় হয়, আমাদিগের দেশের মুনি-ঋষিরা তাহার উদাহরণ। 'নমন্তি গুণিনোজনাঃ' এটি এদেশে প্রবাদবাক্য হইয়া উঠিয়াছে।" বিদ্বজ্জনের ওপর 'সোম প্রকাশ' পত্রিকার এই যে ভরসা তা শতাধিক বছর পরে আজকের এই চরম অশ্রদ্ধার দিনেও তামাদি হয়ে যায় নি। এখনও অধিকাংশের বিশ্বাস, অধ্যয়নই যাঁদের তপস্যা, অন্য কিছু নয়, তাঁরা কোনোরকম অনিষ্ট বা অশান্তির কারণ হতে পারেন না। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁদের একমাত্র উপায় অবিরাম অধ্যয়ন; আর সেই জ্ঞান তাঁদের দেয় আত্মিক প্রশান্তি, যা জগতের অনিষ্ট সাধনের কোনোরকম প্রবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেয় না। 'সোম প্রকাশের' কথা সত্যি হলে বিজ্ঞজন তিনিই, যিনি বই ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে বা জীবকে আক্রমণ করেন না, করার সময়ও তাঁর নেই।

আজও যাঁরা জ্ঞান-তপস্বীর এই শান্তিপ্রিয় হিতৈষী ভাবমূর্তিটি প্রত্যহ পূজো করে চলেন, তাঁরা পূজারী বলেই আজও জানতে চান নি কী দিয়ে গড়া এই মূর্তিটি। যাঁরা জানতে চেয়েছেন তাঁরা অবশ্য টের পেয়েছেন যে, সরস্বতীর বরপুত্র মাত্রেই নির্বিরোধ শান্তিকামী সত্য-সন্ধানী নন, বরং আজকাল এক শ্রেণীর কৃতবিদ্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে যাঁদের জ্ঞান-সাধনা নানান রকম উৎপীড়নের অস্ত্রমাত্র। রাজনৈতিক তাণ্ডবের মত এ উৎপীড়ন অবশ্যই স্থূল শারীরিক হামলার স্তরে নামে না (উচ্চশিক্ষায় বেত বা চাবুকের ব্যবহার নিষিদ্ধ, স্মরণীয়), এ হলো মানসিক প্রহার, intellectual aggression। উদ্দেশ্য, তাজা ও কাঁচা মনের সমস্ত ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাসাকে পিষ্ট করে আনুগত্য আদায় করা। অবশ্য স্থানকালপাত্র অনুসারে পদ্ধতিরও পার্থক্য ঘটে।

কেউ-কেউ মনে করেন প্রকৃত জ্ঞান হলো স্মৃতিশক্তির অনুশীলন। তাই ইণ্টারভিউ নেবার সময় অধ্যাপক প্রার্থীকেও তাঁরা কবিতা মুখস্থ বলার নির্দেশ দেন গম্ভীর মুখে। বাধ্য ছাত্রেরাও, তাই, যে-পণ্ডিত যত বড় উদ্ধৃতি গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলতে পারেন তাঁকে তত বেশী প্রাজ্ঞ বলে ভুল করে। হয়তো এই বিদ্বত্তম ব্যক্তি যে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন তা Hazlitt-এর 'On The Ignorance of the Learned' থেকে, যেখানে আছে, 'he who has the most of this technical memory, with the least turn for other things,

....will make the most forward school boy.' কিন্তু স্মৃতিরত্ন পণ্ডিতের খেয়ালই হয় না যে তাঁর উদ্ধৃতি তাঁকেই ব্যঙ্গ করছে; ছাত্রদেরও সাধারণত হয় না। পীড়িত বোধ করে শুধু সে, যে বুঝতে পারে এই জ্ঞানসাধনা শুধু গোগ্রাসে তথ্য ভক্ষণ করা, তলিয়ে দেখা বা যাচাই করা বা অনুভব করার কোনো সুযোগ এখানে নেই। ল্যাটিন আমেরিকার শিক্ষাবিদ Paulo Freire-এর উপমা প্রয়োগ করলে এ হলো শিক্ষার ব্যাংকিং তত্ত্ব, যেখানে ছাত্রেরা সম্পদ জমানোর লকার মাত্র, শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে 'সব কিছু' গ্রহণ করা যার কাজ, আর শিক্ষকের কাজ 'সব কিছু' এই লকারে এনে ফেলা, প্রয়োজনে যা অবিকল আগের অবস্থায় বের করে আনা সম্ভব। কিন্তু যে-মানুষ তার নিজস্ব সত্তাকে অন্যের সিন্দুকে রূপান্তরিত করতে নারাজ, তার কাছে এই স্মৃতিসর্বস্ব অধ্যয়ন একটা চরম মানসিক উৎপীড়নমাত্র।

কোনো-কোনো বুদ্ধিজীবী আবার শুধু স্মৃতি-শক্তিতে সন্তুষ্ট নন। তাঁদের সমরকৌশলে সব চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র নম্বর—নম্বরে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। জ্ঞানের নামে নম্বরের এই উৎপীড়ন চলছে ও চলবে, যতদিন না নম্বরের অতিরিক্ত কিছুর সন্ধান শুরু হয়। প্রখ্যাত পণ্ডিতেরাও এই নম্বরের মাপ-কাঠির অত্যাচার থেকে বাদ পড়েন না, যেমন অধ্যাপক তারকনাথ সেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'দেশ' পত্রিকায় যে-সব চিঠি-পত্র বেরিয়েছিল তার উপজীব্য বিষয় ছিল অধ্যাপক সেনের পরীক্ষার নম্বর। একজন তো মার্ক-শীটের ট্রু-কপি পর্যন্ত ছাপিয়ে ছিলেন। এমন কি, রাধামোহন ভট্টাচার্যের মত বিদগ্ধ রসিক এই অবান্তর বিতর্কে যোগ দেন ('দেশ', ১লা আশ্বিন, ১৩৭৮)। তাঁর বক্তব্য ছিলো, কোনো এক পরীক্ষায় তারকনাথ সেনের চেয়ে ইংরেজিতে বেশী নম্বর পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন। এই নম্বরের হিসেবে যে কী প্রমাণিত হলো, এমন প্রশ্ন তোলার ছেলেমানুষি অবশ্য এঁরা কেউ করেন নি। বিলেতে অবশ্য এরকম ছেলেমানুষি করার রেওয়াজ আছে। F. W. Bateson তাঁর *Essays in Critical Dissent* গ্রন্থে দেখিয়েছেন পরীক্ষার ফল আর প্রকৃত মেধার যোগসূত্র সেখানেও সর্বদা অবধারিত নয়। এখন, সাহেবদের আপাদমস্তক নকল করলেও আমরা এইরকম ওদের সব কিছুতে প্রশ্ন তোলার প্রবৃত্তির প্রশংসা করতে পারি না। এখানে বিখ্যাত সাহিত্যিককে নিয়ে মজা করা হয় এই বলে যে তিনি বাংলায় ফেল করেছিলেন, এবং সেই প্রবীণ সাহিত্যিকও উত্তেজিত হয়ে বাংলায় কত নম্বর পেয়েছিলেন তা ছাপিয়ে দেন! (দ্রষ্টব্যঃ পুরনো 'দেশ' পত্রিকার পাতায় প্রবোধ সান্যাল ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিবাদ।) নম্বর অবশ্যই তুচ্ছ ব্যাপার নয়, তা নিয়ে U.G.C. বা Selection Board অবশ্যই মাথা ঘামাবে, কিন্তু তার বাইরেও যাঁদের মাথায় সর্বদা নম্বরের পোকা কিলবিল করে তাঁরা প্রায়ই একে-ওকে গুঁতো দিয়ে বসেন, এ অভিজ্ঞতা বিরল নয়।

নবতম উৎপীড়ন—নম্বরের অতিরিক্ত কিছুর দাবী এবং তা হলো প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা। U.G.C.-ও বলেছেন publish or perish। এই পর্বতপ্রমাণ প্রকাশনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে অবশ্য বিজ্ঞজনেরা যে-উদাসীনতা অর্জন করেন, তা গীতা-কথিত কর্মফলে নিরাসক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবে তাৎক্ষণিক জাগতিক পুরস্কারের সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায়, যে-কারণে প্রবীণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও প্রতিপত্তিশালী যশস্বী পুরুষকে দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে নেন, কিংবা উৎসর্গ করেন কোনো মহান নেতা বা নেত্রীকে, এবং তাও এমন ভাষায় যা পড়ে উক্ত নেতা বা নেত্রী বুদ্ধিলোপ না হলে লজ্জা পাবেন। আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই অতিবাস্তব রাস্তাটি তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সুতরাং আমাদের নাক গলানোর এমনিতে কোনো কারণ নেই। কিন্তু এইরকম 'প্রকাশনা'কে যদি প্রকৃত সত্যসন্ধানী গবেষণার লেবেল দিয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয় তবে তা হয়ে ওঠে মর্মান্তিক উৎপীড়ন। অবশ্য এ-ব্যাপারে বিজ্ঞজনেরা সমর্থন ও সান্ত্বনা দুটোই পেতে পারেন বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়। কারণ সাহেবরাই এই রোগ ছড়িয়েছে, এই অপ্রয়োজনে কাগজ ও কালির খরচ বাড়ানোর রোগ। তবে ওদের যেহেতু সমালোচনার রাস্তাটাও খোলা থাকে

তাই বিরুদ্ধ কথাও শুনতে হয়। তাই E. M. W. Tillyard নির্ভয়ে বলতে পারেন, 'I sometimes think that the crude and brutal anti-intellectualism of the Nazi movement was partly due to the excesses of German academic production; to that soulless grinding out of mechanical theses that obscured the genuine nobility of a proportion of German scholarship'. এবং তিনি এও বলতে ছাড়েন না যে, যাঁর অবদান 'a stack of unreflective compilation'. ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর চেয়ে অনেক বেশী উপযুক্ত অধ্যাপক তিনি যিনি কিছু ছাপান নি অথচ চিন্তা করতে পারেন। তাঁর আশংকা Epictetus এই প্রকাশনা পাগল যুগে জন্মালে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই চাকরি পেতেন না।

Muriel Spark-এর নাটক Doctors of Philosophy-তে আধুনিক পি· এইচ· ডি—মানসিকতার যে ব্যঙ্গচিত্র পাই তাতে ঘরের পরিচারিকা পর্যন্ত অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করার সময় কে কোন বিষয়ে পি·এইচ·ডি· তা বলতে ভোলে না। একজনে বলে, I tell all my friends, I say 'They are Doctors of Philosophy, every one of them. They live such dignified lives, my dears. They have stately conversations with each other.' আমাদের এখানেও এরকম একটা পি· এইচ· ডি· কলোনি তৈরী হয়েছে, যেখানে ব্যক্তির পরিচয় সীমাবদ্ধ শুধু একটি গবেষণার বিষয়ে। এই কলোনিতে সর্বদা পড়ুয়ার প্রতিযোগিতা চলে। এমনকি ভয়ংকর দুর্ঘটনার মুহূর্তেও। Spark-এর নাটকে একটি চরিত্র আত্মহত্যার জবানীটুকুও লিখে যায় গ্রীক ভাষায়, যা অনুবাদ করে বুঝতে হয়; এবং যিনি অনুবাদ করেন তিনি অবশ্য ঐ সংকটেও তার ভুল সংশোধন করতে ভোলেন না।

চব্বিশ ঘণ্টা অপরের ভুল সংশোধন করার ব্যাপারে বোধ হয় এঁদের জুড়ি নেই। পুরনো সেই গল্পের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত এঁরা। শীতে অর্ধনগ্ন দেহে কষ্ট পাচ্ছেন দেখে তাঁকে রাজা জিজ্ঞাসা করেন (সংস্কৃতে), আপনার কি গরম কাপড় দরকার? ব্রাহ্মণের উত্তর, শীতে যতটা না কষ্ট হচ্ছে তার চেয়েও বেশী কষ্ট হচ্ছে আপনার অশুদ্ধ সংস্কৃত শুনে। বেঁচে থাকার সমস্যার চেয়েও যে ব্যাকরণের সমস্যা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, এই উপলব্ধি বিজ্ঞ না হলে হয় না, দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই দেখা যায় একটি ইংরেজি শব্দের বানান বা উচ্চারণ বা প্রয়োগ নিয়ে রাজায়-রাজায় মাসের পর মাস যুদ্ধ হচ্ছে। এরই ফলে স্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকায় মাঝে-মাঝে চিঠি বের হয় article বা appropriate preposition-এর ভুল ধরে। কয়েক বছর আগে খোদ রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটি শিক্ষা সংকটের আলোচনায় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতেই 'May I say, sir?' না 'May I speak, sir?' কোন্‌টা শুদ্ধ ইংরেজি তা নিয়ে বহুক্ষণ তর্ক চলে দুই প্রবীণ মন্ত্রী ও শিক্ষাবিদের মধ্যে, শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরী থেকে নেস্‌ফিল্ড সাহেবকে ধরে আনতে হয়। স্টেট্স্‌ম্যানের নাট্যসমালোচক কদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে একজন স্বনামধন্য বাঙালি অভিনেতা সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি 'few' আর 'a few' এ দুয়ের পার্থক্য জানেন না। তবে বোধ হয় তাঁর অভিনয় এক্ষুনি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

স্পষ্টই বোঝা যায় এইসব বিজ্ঞজনেরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেও যা অর্জন করতে পারেন নি তা হলো কাণ্ডজ্ঞান। Jaques মানুষের 'seven ages'-এর কথা বলেছেন; Erik Erikson বলেছেন 'eight ages'-এর কথা। এইসব বিজ্ঞজনের কিন্তু একটিই বয়স—দীর্ঘায়িত কৈশোর। তাই তাঁদের উৎপীড়নে মাঝে-মাঝে যন্ত্রণার বদলে মজা লাগে। গেটে না গ্যয়টে? ব্রেখ্‌ট না ব্রেষ্‌ট না ব্রেক্ষ্‌ট? কোনটা ঠিক সেই প্রশ্নকেই এঁরা সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, অথচ সাহেবরা 'ঠাকুর' না বলে 'টেগোর' বলে যাচ্ছেন কোন অধিকারে সে কথা খেয়াল রাখেন না। কিন্তু আক্রমণকারী বিজ্ঞজনদের সবাই-ই অপ্রাপ্তবয়স্কতা থেকে ভোগেন না। কারণ প্রাপ্তবয়স্কের সমস্ত সূক্ষ্মতার

ভানও নজরে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। 'দেশ' পত্রিকায় 'রূপদর্শীর' কাছে খোলা চিঠিতে শিবনারায়ণ রায় যখন লেখেন, রাত্রে শুয়ে শুয়ে প্লেটোর সঙ্গে তর্ক করে তাঁর ঘুম হয় না, কিম্বা সুন্দরী রমণীর চেয়ে স্পিনোজার সঙ্গ তাঁর বেশী পছন্দ, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না এ হলো জ্ঞানচর্চার অতি আধুনিক প্রাপ্তবয়স্ক মার্কা আত্মবিজ্ঞাপন, যা ভাষায় ও ভঙ্গীতে আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য বলেই মনে হয়। Spark-এর নাটকে আর একটি পরিচিত দৃশ্য পাই। একজন পি·এইচ·ডি-র বৈঠকখানায় অজস্র বই দেখে জনৈক পেশীবহুল অশিক্ষিত লরী-ড্রাইভার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেঃ Do they read them all? উত্তরে Mrs. D.: They don't use them for reading, they are educated people, they refer to them. অতিরঞ্জন নয়, অনেকেই এরকম বই সাজিয়ে রাখেন অতিথিকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য, কিম্বা আমরা যাকে বলি impress করার জন্য। 'impressive' না হয়ে উঠতে পারলে জ্ঞানীর স্বীকৃতি পাওয়া অসম্ভব। সাদাসিধে হাবভাবের বিদ্যাসাগরেরা এখন শুধু ইতিহাস। এই বিদ্যাসাগরদের মূর্তি শুধু তরুণেরাই ভাঙছে না, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞজনেরাও ভেতরে-ভেতরে শিক্ষাবিদের এই মূর্তিটাকে ভেঙে ফেলেছেন।

আজ মানুষকে 'impress' করতে হয় বলেই বিজ্ঞজনেরা সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার যে দিকগুলি বিপজ্জনক তাই গ্রহণ করেছেন। ভেতরে ভেতরে তাঁরা রক্ষা করছেন সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতা, ঘরে ও বাইরে; আর মন পড়ে থাকছে বিলিতি স্বীকৃতির দিকে। অধ্যাপক পি· সি· ঘোষের আমলে নাকি শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন; গ্রামের স্কুল-কলেজে এখনও তা আছে, নেই কলকাতার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। অথচ সাহেবরাও নাকি আজকাল ছাত্রদের সঙ্গে খুবই মাখামাখি করেন, শোনা যায়। বিলেত থেকে ফিরে বিদ্বান ব্যক্তিরা বরং এসব গল্প শোনাবেন, generation gap, বা alienation-এর ওপর বক্তৃতা দেবেন, কিন্তু কদাচিৎ বিলেতের এই অভিজ্ঞতাটুকু প্রয়োগ করার চেষ্টা করে থাকেন। তাই অবাক হয়ে Edward Shils লিখেছিলেন *Encounter* কাগজে যে, ভারতীয় শিক্ষক সমাজে, 'there is, in any case, no tradition to invite a student home for a meal or tea. Neither teacher nor student would be at ease in such a situation, neither would have pleasure in the other's company' বরং যে অধ্যাপক ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার চেষ্টা করেন, তাঁদের তর্ক করার অধিকার দেন, জীবনকে খোলা চোখে দেখতে সাহায্য করেন, অর্থাৎ প্রচলিত আত্মশ্লাঘার কলাকৌশল পরিহার করেন, তাঁকে যেন এক মিলিটারি ব্যারাকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করতে হয়।

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাবিদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণবিধির দিকে তাকালেই বোঝা যায় কীভাবে চলনে-বলনে পরিধানে তাঁকে স্বাভাবিক মানবিক কামনা ও প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়। বেশী হাসলে তাঁকে 'ব্যক্তিত্বহীন' বলা হবে, তাই তিনি হাসতে ভয় পান; বৃটিশ আমল থেকেই আমাদের চোখে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হল ম্যাজিস্ট্রেটের বা দারোগাবাবুর ব্যক্তিত্ব। এমন কি খিদে পেলেও অধ্যাপকের যে কোনো দোকানে ঢুকে খাওয়া উচিত নয়; স্মরণীয়, সাহেবরাও এদেশে নেটিভদের সঙ্গে এক দোকানে আহার করতো না। আর সিনেমা-থিয়েটারে আগ্রহ দেখানোর অর্থ প্রমাণ করে ফেলা যে, এখনো অ্যাকাডেমিক শুদ্ধতা ও নিষ্ঠার অভাব আছে। যে-সব অধ্যাপক কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা হাড়ে-হাড়ে জানেন অ্যাকাডেমিক শুদ্ধতা কতটা মারাত্মক। কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি কেয়া চক্রবর্তীকে চাকরি ছাড়তে না বাধ্য করত তবে হয়তো অর্থ সংকটে পড়ে তাঁকে জলে ডুবে মরতে হত না। আজ অক্সফোর্ড সত্যজিৎ রায়কে ডক্টরেট উপাধি দেওয়ায় আরও প্রমাণ হল আমাদের শিক্ষা-চিন্তা কতটা সনাতন, কতটা সংকীর্ণ, কতটা রক্ষণশীল; কারণ এই কাজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনেক আগে করার কথা।

এক কথায় এখানে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশটিই আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পীড়নমূলক। ব্যক্তিত্বের

পূর্ণবিকাশ, গোটা মানুষের আত্মোপলব্ধি? ওটা রসিকতা! এই রসিকতার শিকার শুধু ছাত্ররাই নয়, শেষ বিচারে শিক্ষকও এবং সমালোচ্য বিজ্ঞজনেরাও। যে-শিক্ষা মনের কোনো দরজা খুলে দিতে পারে না তার শিব গড়বার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ একটি উৎপীড়ন আর একটির জন্ম দেয়, একটি বিকৃতি থেকে আসে আরো অসংখ্য বিকৃতি। আজকের ছাত্র-সমাজে চিন্তাহীন রাজনৈতিক আনুগত্যের যে মারমুখী প্রকাশ দেখা যায় তার যোগসূত্র মিলবে ক্লাশরুমে দীর্ঘদিনের মানসিক দাসত্বে। যেখানে নির্বাচনে অধ্যাপক প্রার্থী 'ব্রিলিয়ান্ট' ছাত্রের প্রচারপত্র হাতে ভোট চান, এবং নামজাদা কলেজের নকশাল ছাত্র খারাপ কলেজের নকশালের চেয়ে বেশী গুরুত্ব ও আদর পায়, সেখানে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা যেমন এই রাজনৈতিক অনাচারকে টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে, রাজনীতিও তাকে রক্ষা করে চলেছে সমান তালে। তাই বিজ্ঞজনের পীড়ন আরো বড়ো এক উৎপীড়ন-ব্যবস্থার অংশমাত্র। কিন্তু শিক্ষার এক্তিয়ার যতটুকু তার মধ্যে থেকেই এই উৎপীড়নকে প্রতিহত করা যায়। অন্তত প্রকৃত সত্য-সন্ধানী জ্ঞানী-জনেরা শুধু বনস্পতির মত না দাঁড়িয়ে থেকে আজ একটু পরস্পরের কাছে এসে প্রমাণ করুন—এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা আসলে এক 'compulsory miseducation', এবং সেই শিক্ষা প্রয়োজন যাকে রক্ষণশীলেরা ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে 'subversive' বলে গাল দিয়ে এসেছে।

কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে

সুমন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকের ইচ্ছে, তাঁর এই হতভাগ্য বাঙ্গালী বন্ধুটি কলেজ-জীবন নিয়ে দু-চার কথা লিখুক, মোদ্দা ভাষায় স্মৃতিচারণ করুক। বহুদিনের বন্ধুত্বের সুবাদে তিনি ভালই জানেন, 'প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা'র সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা নেহাতই বোকামি। পেটে গোঁত্তা খেলেও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আমার কলমে আসে না। বলতে পারেন বিদগ্ধ 'প্রেসিডেন্সিয়ান' (যেমন ইউরোপের লোক ইউরোপীয়ান) লেখক-লেখিকাদের মাঝে আমাকে অকারণ তলব করা হয়েছে তালভঙ্গ করতে। পত্রিকা নামক দুগ্ধপাত্রে গোচনা ঢালব, এই স্বীকারোক্তিটা তাই গৌরচন্দ্রিকাতেই করে রাখা সঙ্গত মনে করছি।

'স্মৃতি সততই সুখের'—শ্রীমতী প্রতিভা বসুর এই মন্তব্যে ষোল-আনা বিশ্বাস থাকলে, সেই সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করেই সম্পাদকের ইচ্ছে শিরোধার্য করা যেত। তবু ছাড়ায়ে যেতে চাইলেও বাধা জড়ায়ে ধরে, যা পেয়েছি তাই নিয়েই নিঃশব্দে কেটে পড়ার ইচ্ছে নিয়েও কী পাই নি তার হিসেব চোকাতে হয়। তাই 'যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ' তাদের কথাও যেমন মনে আসে, 'যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ' তাদের কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভুলতে পারিনে। বিনয়ী কবি তবু হয়ত লেখেন 'সবারে আমি নমি।' 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'—কথাটি আমার ক্ষেত্রে সত্যি হলে, আমিও হয়ত নির্দ্বিধায় কবিকে অনুসরণ করতাম।

ইংরেজি প্রবন্ধ লিখে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তার ফলের তলিকা থেকে, খুবই পরিশ্রম করে গুটিকতক ভাগ্যবান ছেলের নাম আমাকে উদ্ধার করতে হয়েছিল। পরে দেখেছিলাম, পুরনো দালানের ঘরে-ঘরে এই একই দৃশ্য। অস্বীকার করার উপায় নেই, সাদামাটা বাংলা ইস্কুল থেকে পাশ করে, প্রমীলা-পুরীতে নির্বাসনের ভাবনাটা প্রথমদিন যত না রোমাঞ্চকর ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল ভীতি-দায়ক। আজ তিন-তিনটে বছর ঘুরে গেছে, প্রথম দিনের ভয়কে দোর্দণ্ডপ্রতাপে জয় করে ফেলেছি—তবু কখন অলক্ষ্যে ক্ষোভ জন্মে গেছে।

আমার পাড়ার এক লাজুক বন্ধুর মুখে শুনেছি, একদিন কলেজে আমার খোঁজ করতে এসে, পুরনো দালানের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়, তার নাকি পা সরছিল না। জরুরী কাজের তাগিদে, লজ্জার মাথা খেয়ে যদিবা সে আমার ক্লাসের ঘরটি পর্যন্ত আসতে পেরেছিল, তবু উঁকি দিয়ে অসংখ্য শাড়ী-ট্রাউজার্সের ফাঁকে আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি নাকি তার চোখে পড়ে নি। সেদিন সে ঘরে আমি ছিলাম আঁচল-চাপা। সেই থেকে বন্ধুটি বলে, আমি মহিলা কলেজে পড়ি। কোনদিন আমার প্রতিবাদ করার সাহস হয় নি।

এই দালানের ঘরে-ঘরে চোখ বুলিয়ে, বহিরাগত কেউ যদি এমন সিদ্ধান্তে আসেন যে, এইসব ক্লাসে, চাকরীর খাতায় অনুন্নত শ্রেণীর প্রার্থীর মতন, দু-একটি করে ছেলেদের আসন সংরক্ষিত থাকে, দোষ তাঁর নয়। বাপ-ঠাকুরদার মুখে যখন শুনি, একসময় এই

কলেজের বারান্দায় ধুতি-প্যাণ্টেলুনের মিছিলে কদাচিৎ দু-একটি শাড়ীর আঁচল চোখে পড়ত, ভুরু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। আবার এই কলেজেই শুনি এমন একদিন ছিল, যখন মেয়েদের প্রবেশাধিকারই ছিল না। ইতিহাসের ছাত্র হলেও, এই ঐতিহাসিক সত্যকে বিশ্বাস করতে পরিশ্রম হয়। তার চাইতে আমার চোখের সামনে, যে প্রায় অবশ্যসম্ভাবী ঐতিহাসিক সত্যকে বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ হয়, তা হল, ভাবী মা, মাসী বা মাম্‌মীরা যখন বলবেন "আমরা যখন পড়তাম, প্রেসিডেন্সিতে পুরনো দালানে ছেলেদের টিকিও চোখে পড়ত না।" এই সত্য, যদি কোনদিন সত্যি-সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়, আমার পাড়ার বন্ধুটি তাহলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবে।

সে যাই হোক, নিবন্ধকারের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হওয়ার বিশেষ বাসনা নেই। তার মনে হয়েছে নারী-প্রধান ক্লাসে পড়াশুনা ছেলেদের কাছে বস্তুত এক ধরণের নির্বাসন। অবশ্য একথা জানা নেই, সংখ্যালঘু ছাত্র মহলে সবাই আমার কথায় সায় দেবেন কিনা। প্রশনটা তুললাম এই কারণে যে, নারী-সঙ্গ বঞ্চিত কেউ হয়ত একে অতিরঞ্জন বা অতিভাষণ ঠাউরে বসতে পারেন। কেউ বলবেন নারী-বিদ্বেষ। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, নারী-সঙ্গ যদিবা যৌবনের একটি উপরি-পাওনা, তবু ক্রমাগত নারী-সঙ্গ সেই ভবিষ্যৎ সঙ্গলাভের অনাস্বাদিত অথচ অভিলষিত স্বাভাবিক কামনাকে হয় অস্বাভাবিক করে নতুবা অংকুরেই বিনষ্ট করে। অবলা নারী সাহচর্যে পৌরুষ মাথা নোয়ায়, যৌবনের গরম রক্ত প্রায়ই নিস্তেজ থাকে। কোন শাড়ীটা ভাল আর কোনটা নয়, কোন অনুষ্ঠানে কোন সুন্দরী কী বেশে যাবেন, কার চুলের দৈর্ঘ্য পিতৃপরিচয়কে প্রকাশ করে ফেলছে তাই ছাঁটা প্রয়োজন—ইত্যাদি আলোচনা নারী-চক্রের প্রধান উপজীব্য। পড়াশুনোর বাইরে ছেলেদের একটা আলাদা জগৎ আছে, আছে তাদের কসমেটিক্‌সের উর্দ্ধে নিজস্ব কিছু আলোচনা। তেমন সুযোগ এ দালানে মেলা ভার।

ভারত-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে কাতারে-কাতারে শরণার্থী আসার মতন, কেন দলে-দলে মেয়েরা ইস্কুলের ফ্রক ছাড়লেই প্রেসিডেন্সির শরণাপন্ন হন—সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। তবে এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করার আগে, মনে রাখতে হয় যে, স্কুলের গণ্ডী যাঁরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হন, এ কলেজের দরজা কেবল তাঁদের জন্যই উন্মুক্ত। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তাই সংকুচিত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক না হলে দেশোদ্ধার হবে না, এই চিন্তায় ভাল ছেলেরা ইদানীং কলা-বিভাগকে কলা দেখাচ্ছেন। যাঁরা দেখাচ্ছেন না, প্রধানত দুটি ভাগে তাঁদের ভাগ করা যেতে পারে; এক, যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজ্ঞানের হাতছানি উপেক্ষা করেন, আর দুই, যাঁরা অন্য কোন বিভাগে বিশেষ পাত্তা না পেয়ে, নাই মামার চাইতে কলা-বিভাগ নামক কানা-মামাতেই সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হন। ছেলেদের অধিকাংশ ইস্কুলে আমার মন্তব্যের ব্যতিক্রম চোখে পড়বে না একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। মেয়েদের বিধাতা একটু অন্যভাবে গড়েছেন, মেয়েদের ইস্কুল-গুলোর চেহারাও তাই কিছুটা স্বতন্ত্র। সেখানে খুব দুঃসাহসী না হলে সাধারণত কেউ বিজ্ঞান বিভাগে নাম লেখান না। অবশ্য বাসে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবী জানিয়েও, আজকাল মেয়েরা ডাক্তার-বদ্যি হবার পথে পা বাড়াচ্ছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে, এই অবস্থার প্রতিফলন খুব বেশী করে পরিষ্কার। আমার মতন যে দু-চারজন এখনও পুরনো দালানে ঘোরাফেরা করছেন, তাঁদের বোধ হয় হৃৎকম্পন মাপার যন্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে কিংবা পেন্সিল দিয়ে নকশা তৈরীর বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। আর মাঠের ওপারের বাড়িগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রের অবাধ বিচরণ এখনও চোখে পড়ে। ঈশ্বর করুন, এঁরা থাকেন; নতুবা আমাদের উত্তরসূরীরা হয়ত প্রাণ খুলে বাক্যালাপ করার ইচ্ছায় প্রেসিডেন্সির চার-দেওয়ালে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, শেষমেশ ছেলেদের কলেজের দিকে দৌড়োবেন। অন্তত এই লেখকের এতটা দুর্দশা হয় নি। ক্লাস ছেড়ে, ক্যাণ্টিনে ছেলেদের টেবিল পর্যন্ত গেলেই তার চলেছে।

ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হয়ে, যেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলাম, বুঝেছিলাম সেদিনই, এ ছোট

তরীতে বাংলা ভাষার স্থান নেই। ইস্কুলে, আমার এক সহপাঠী যে ছেলেবেলা থেকেই আমার বিষয়ে আমার চাইতে অনেক বেশী দক্ষ, কেবলমাত্র ভাল ইংরেজি লিখতে পারে না বলে এই কলেজে তার জায়গা হয় নি। বন্ধুটির মুখে শুনেছি, ওদের কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয় না, লাইব্রেরীর ভাঁড়ে মা ভবানী; অথচ পড়াশুনায় ওর ষোল-আনা ইচ্ছে। বাবা-মাকে ছাড়া দোষ দেবার মতন কেউ ওর নেই। যদি তাঁরা নিজেরা অভুক্ত থেকেও ওকে ইংরেজি ইস্কুলে ভর্তি করতেন, হয়ত আজ এই আক্ষেপ ওকে করতে হত না। পরিসংখ্যান নিলে হয়ত দেখা যাবে, এমন কত শত ছেলে-মেয়ে বাঙ্গালী বলে, কিংবা ইংরেজি শেখে নি বলে কলেজ স্ট্রীটের ছায়া মাড়াতে সাহস পান না। এঁদের শূন্য-স্থান পূরণ করেন, দু-লাইন ব্যাকরণ ঠিক রেখে ইংরেজি লিখতে-জানা ধনীর দুলালী, কখনও-কখনও নির্ভেজাল ভেতো বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের ফিরিঙ্গী রঙ্গিনী। ইংরেজি যদি কেবল এঁদের লেখ্য ভাষা হত, গোলামির মজ্জাগত স্বভাবকে তাও ক্ষমা ঘেন্না করে দেওয়া যেত। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-ইতিহাস ইত্যাদিতে ক-অক্ষর-গোমাংস হয়েও, ইংরেজি ভাষা এঁদের কথ্য, ইংরেজের সংস্কৃতির ছিবড়েটুকু নেপথ্য, আর বিকৃত ফিরিঙ্গী ভাব-ভঙ্গী নির্ভুলভাবে অভ্যস্ত। এইভাবে, তিন-তিনটে বছর এঁরা ফিরিঙ্গি নাচ নেচে বেড়ান, আর সত্যিকার বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা কলেজের অভ্যন্তরে কখনও নাচ দেখেন, কখনও ক্ষীণ স্বরে পোস্টারে লেখেন 'অপ-সংস্কৃতি'। প্রতিবাদের সেটাই শুরু, সেটাই শেষ।

"How can you transform yourself from L.S.D. to love-making"—জনৈকা প্যাণ্টেলুন-পরা মেমসাহেবের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমার কলেজ-জীবনের সূত্রপাত। পরে নাম-ধাম দেখে যাঁদের আমার স্বজাতি ভেবে বসেছিলাম, তাঁদের অনেকেই আমাকে নিরাশ করেছেন। কিশোর-বয়সে বাঙালী মেয়ের যে ছবিটার স্বপ্নে আমি প্রায়ই বিভোর হতে ভালবাসতাম, কলেজে তাকে কদাচিৎ খুঁজে পেয়েছি। হাড়-কাঁপানো শীতে যে সহপাঠিনীকে বাংলা প্রশ্নপত্র সামনে রেখে ঘামতে দেখেছি, সুরেলা গলায় সেই আবার বারান্দায় বসে রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়েছে। এদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছি অনেক, অনেকবার। প্রায় প্রতিবারই আমার কণ্ঠস্বর 'হায়' 'হ্যালো'-র হাওয়ায় উড়ে গেছে।

জিজ্ঞাসু বন্ধু জানতে চেয়েছেন ইংরেজিয়ানা বলতে আমি কী বুঝি, কেনই বা আমার ক্ষীণ কণ্ঠ বারে-বারেই তার বিরুদ্ধে কথা ছুঁড়ে মরে? আমার প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে? ইংরেজি ভাষার? সাহিত্যের? সংগীতের? পোষাকের? সংস্কৃতির? না, এসবের কোন কিছুর বিরুদ্ধেই নয়। আমি নিজে ইংরেজিতে প্রশ্নের উত্তর লিখি, শেক্সপীয়র, কীট্‌স্‌, শেলি, বায়রনের নাম সশ্রদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করি, শার্ট-প্যাণ্ট পরি, ইংরেজি গানও যে শুনি না তাও নয়। অতএব এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অর্থ যে নিজেকেই গাল-পাড়া, বাঙালী হলেও আমি সেকথা বুঝি।

প্রতিবাদ আমার ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের মানসিকতার বিরুদ্ধে। যে মানসিকতার তাড়া খেয়ে বাঙালী যুবক-যুবতী, গো-শাবকের পালের মত ইংরেজি-মিডিয়াম ইস্কুলের ছাতের তলায় জড়ো হয়, যে মানসিকতা ইংরেজির মাস্টারের কাছে নিত্য-বেত-খাওয়া অভিভাবকের ছেলে-মেয়েকে ইংরেজের 'কমল কাননে'-র কোন হদিশ না দিয়ে, কেবল 'শৈবালে' খেলায় মত্ত রাখে। আমার প্রতিবাদ সেই সব বাড়িগুলোর বাঙালী মালিকদের বিরুদ্ধে, যাঁদের বসবার ঘরে ডিস্‌টেম্পার করা দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবির তলায় এই মানসিকতার জন্ম হয়, তালিম হয়। আমার প্রতিবাদ সেই সব সেণ্ট্‌-মার্কা ইস্কুলগুলোর বিরুদ্ধে, যেখানে এই মানসিকতার বিকাশ হয় তৃতীয় শ্রেণীর বাঙালী শিশুকে বিদেশী ভাষায় অস্ট্রেলিয়ার ভল্লুকের বা সিয়াম দেশের বিড়ালের গল্প শুনিয়ে। আবার যখন শুনি, কুলীন কায়স্থ যে ইস্কুলের মালিক কলকাতার হাঁকডাক-ওয়ালা তেমন একটি ইংরেজ কুলীন তৈরী করার কলে, দশ-বছরের বাঙ্গালী শিশু বাংলায় কথা বললে জরিমানা হয় বা এণ্টালী পাড়ার ঐ একই জাতের ইস্কুলে ঐ একই কারণে ছেলেদের সাসপেণ্ড করা হয়, ভাবি প্রতিবাদে

কিছু হবে না। কীসে হবে বুঝি, অকারণ গলাবাজি করি না, দেশদ্রোহী হয়ে যাবার ভয়টা থেকেই যায়। তাই, সেই সাহেবী শিক্ষার প্রমাণ যাদের বেশ-ভূষায়, আবরণে তাদেরকে আলাদা করে কখনও দোষ দিই নি। হিসেব চুকাতে বসে আজও দেব না। তাছাড়া চাকরীর নিয়মে, মাস-পয়লায় যে পিতৃদেবকে সরকারের পাওনাটুকু চুকিয়ে দিতে হয়, তাঁর সন্তান হয়ে এঁদের দোষী সাব্যস্ত করার অধিকার সমাজ আমাকে দেয় নি। তবু ভেবেছি, প্রেসিডেন্সি নামক তাসের দেশে যদি কোন হরতনী, ইসকাবনী কিংবা চিঁড়েতনী নির্বাসনের দুঃখ বুঝতে পারেন। যদি তাঁদের কেউ বুঝতে পারেন, কেবল লিখিত আইন ভঙ্গ করাই বে-আইন নয়, পাকস্থলীতে ডাল-ভাত পুরে, ইংরেজির কলে বন্দী হওয়াও বে-আইন! না, ভেবেছি বটে তবে তাদৃশী সিদ্ধিলাভ হয় নি। এঁরা আত্মবিশ্লেষণে অপারগ, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও ভাল-মন্দ বিচারে অসমর্থ, তাই সাহেবের লেজে গাঁটছড়া বেঁধে এঁরা মাতৃগর্ভে ইংরেজের দেওয়া বুটের লাথি মারতে পারেন। আমার প্রতিবাদের জবাবে, আমার অনুরোধের বাঙালী-পনায় হতাশ হয়ে, বিরক্ত হয়ে মেমসাহেবরা বিকৃত মুখ করে বলে উঠেছেন—'বাস্টার্ড' সান অফ এ বিচ্, তবু ভাগ্যি, আমাদের শাসত্র বলে কুকুরের বেশেই ধর্ম যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ নিয়েছিলেন!

এ তো গেল, যে-ইংরেজি বিলাসিনীর বাড়ির টেলিফোনে পুরুষ-কণ্ঠ তাঁর বাপ-মায়ের রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়, সেই মেয়ে বা ছেলে-মেয়েদের সাহেব-সাজার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। তবে, এদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্পর্কটা যমজ ভাই-এর সম্পর্ককেও হার মানাবার মতন। এইখানেই আমার প্রকৃত প্রতিবাদ।

প্রেসিডেন্সি সরকারের কলেজ। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অর্থে প্রতিপালিত কলেজ। সাধারণ মানুষ কারা? যাঁরা সরকারকে কর দেন, কর ফাঁকি দেবার জন্য চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট রাখেন না। অথচ এই কলেজে সাধারণ বাঙ্গালী সন্তানের প্রবেশাধিকার ঠিক ততখানি নেই, যতটা থাকা উচিত। এ কলেজ কেবল ইস্কুলের কৃতী ছাত্রের, আর কৃতী ছাত্রের পরিচয় তার ইংরেজি জ্ঞানে (অবশ্য মানবিক শাখায়) অর্থাৎ এ দালানে ইংরেজি-জানা কৃতী ছাত্রের থাকার অধিকার, বাংলা-জানা কৃতী ছাত্রের নয়।

ইংরেজি জানে কে? প্রধানত ধনীর দুলাল, কোন-কোন ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়ে। ইংরেজি ইস্কুলগুলোর মাইনে দেখলেই আমার কথার সত্যতা প্রতীয়মান হবে। তাহলে দেখা গেল, এই কলেজে, বিশেষত কলা বিভাগে, প্রবেশাধিকার এমন কিছু পরিবারের ছেলে-মেয়ের যাদের সংখ্যা সাধারণ্যে চোখে পড়ার মত নয়, যাদের শিক্ষা বাংলাদেশ বাঙ্গালী-য়ানার তোয়াক্কা করে না। বাংলাদেশে এটি একটি বিদেশীয় এবং বিজাতীয় প্রতিষ্ঠান।

ছা-পোষা করদাতারা হয়ত বোঝেন না, সরকারকে টাকা দিয়ে তাঁরা দুধ-ভাত দিয়ে নিজের ঘরে কালসাপ পুষছেন। কিন্তু সরকার তো বোঝেন, বোঝেন তো কর্তৃপক্ষ? সরকারের গুম মেরে থাকার না হয় একটা অর্থ আছে, রাজনীতির সঙ্গে ধনীর টিকি আছে বাঁধা, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ? তাঁরা তো মাস-পয়লা বেতন পেলেও যা পান তাতে সন্তুষ্ট নন। তবু কেন মৌনাবলম্বন?

এই কলেজে কর্তৃপক্ষের এই মৌনাবলম্বনের প্রতিবাদ যে কয়টি হতভাগ্য জানিয়েছিল, বাংলা ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষার দাবীতে আন্দোলনে নেমেছিল, নিবন্ধকার তাদের মধ্যে একজন। 'অপ-সংস্কৃতি' নামক ধোঁয়াটে সংজ্ঞার লেবেল মেরে এর বিরুদ্ধে পরে সুবিধে বুঝে কোন-কোন সখের রাজনীতিবিদ প্রতিবাদ জানিয়েছেন বটে। তবে জোড়াসাঁকো থেকে টিকটিকি তাঁদের খবর নিয়েছে শুনলেই সোজা আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন।

উপলব্ধি থেকে প্রতিবাদ করছি ভেবে, যাদের সঙ্গে বাংলা ভাষার সমমর্যাদার দাবী নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলাম, তাদের সৎ বললেও সততার অপলাপ হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতির গন্ধ মিশেছিল বলেই হয়ত রাজনীতির সুগোপন কৌশলও ছিল মিশে। সেদিন একথা ভালভাবে বুঝি নি। পরে বুঝলাম যখন দেখি, আমারই সমগোত্রীয় যাকে ভেবে বসেছি, সে-ই

ভোট পাবার আশায় ইংরেজিয়ানার কোন সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। এ কলেজের আবহাওয়া যদি ইয়াঙ্কি সংস্কৃতিতে ভরপুর, রাজনীতি তা হলে বকধার্মিকতার নামান্তর। কি বাম, কি ডান। এ কলেজে সবাই প্রতিক্রিয়ার দুর্গের ইঁট ভাঙে, পরে গিয়ে যারা ইঁট ভাঙে তাদেরই পিঠে চাবুক চালায়।

তবু সেই আন্দোলনের একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল, তাই একেবারে ভস্মে বোধ হয় ঘি ঢালা হয় নি। তারপর থেকে এই গত বছর দুয়েক যাবৎ বাংলায় প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তর লেখা চলতে পারে বলে মনে হচ্ছে। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, কথাটি যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের মাননীয় অধ্যাপকদের অনেকেই ইংরেজি ও বাংলার তুলনামূলক বিচারে এখনও ইংরেজের তলপিবহন পছন্দ করেন। চিরদিনের বিজাতীয় সংস্কৃতির আড্ডা (যদিও অনেকে ব্যতিক্রম আছেন) প্রেসিডেন্সি নামক মক্‌কার পবিত্রতা বাংলাভাষী, বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে কলুষিত হবে—কর্তৃপক্ষের ভাবটা অনেকটা এই রকম। প্রেসিডেন্সির ঐতিহ্য যদি স্বদেশ-প্রবাসী অথচ স্বদেশ-বাসীর অর্থে প্রতিপালিত ছেলে-মেয়েদের ফ্যাশান-ক্লাব হয়, সেই ঐত্যহ্যকে এই হতভাগ্য লেখক অস্বীকার করে।

যে ঐতিহ্য নিয়ে কর্তৃপক্ষের গর্বের শেষ নেই, বিজাতীয় সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী সংক্রমণে সেই জ্ঞানগত উৎকর্ষের অবনমনের গতি কতটা দ্রুত, ছেলে-মেয়েদের জটলায় একবার কান পাতলেই তা সহজে অনুমেয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলে-মেয়েরা আর দেশ-বিদেশের সমস্যা নিয়ে ভাবেন না, যদিও দেশের সমস্যায় অতীব চিন্তিত এমন একটা ভাব দেখান। এই ভাব থেকে জন্ম নিয়েছে 'আঁতেল' শব্দটি (Intellectual এই ইংরেজি শব্দের অপভ্রংশ)। প্রমথ বিশী বলেছিলেন, চোয়ালে-ইন্‌টেলেক্‌ট্‌ অর্থাৎ ইন্‌লেটেক্‌চোয়াল। একেবারে তাই, এঁদের ইন্‌টেলেক্‌ট্‌ কেবল চোয়ালের অকারণ ব্যবহারেই প্রকাশ পায়, সমস্যার সমাধানে সামিল হয়ে নয়। সুস্থ সংস্কৃতির পাট একরকম গেছে চুকে, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎ-এর জায়গা নিয়েছে Mills and Boon. বিয়ের বাজার সম্পর্কে অভিভাবকের সম্যক ধারণা থাকায়, তাঁদের প্রেরণায় দু-চারজন এখনও রবীন্দ্রনাথের গান করেন বটে, তবু সে গান পয়সা-দেওয়া মাস্টারের শিক্ষা আর প্রকৃতি-দত্ত গলার ফল, সে গানে রবীন্দ্রনাথ নোই। বাংলা ছবি কিংবা নাটক দেখতে যাওয়ার আগে সংবাদপত্রে সমালোচনা দেখে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। অথচ চৌরঙ্গী পাড়ায় কিংবা কলামন্দির, বিদ্যামন্দিরে (মন্দিরই বটে), উড়োজাহাজে চড়ে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ এলে, তাদের দেখার জন্য রামকৃষ্ণের টাকার সঙ্গে মাটির তুলনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়। এই কলেজের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা আর কবে পরমান্ন খেয়েছি, তাই হাতে গন্ধ শোঁকা—দু'টো একই ব্যাপার। অবশ্য যে কলেজের ঐতিহ্য চিরদিনই বিজাতীয় তার উন্নতি বা অবনতিতে লেখকের আনন্দ বা দুঃখ কোনটাই হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"কচুর আবাদ করিয়া কলার কাঁদি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না।" এ কলেজে যে কচুর আবাদ হয় কর্তৃপক্ষের তাতেই নজর নেই, তা পরিতাপ করবেন কী করে?

এ কলেজ-সম্পর্কিত লেখায় রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণের বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। তবে স্মৃতিচারণের সঙ্গে যখন শেষ-মেশ তাঁর শরণ নিতেই বাধ্য হলাম, তখন তাঁকে দিয়েই শেষ করি। বঙ্গশাবককে হবু-ইংরেজ হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন "জিজ্ঞাসা করি জর্মানি যখন ফরাসি শিখিত, তখন কি সে ফরাসি ভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল। জার্মান-রচিত কোন্‌ ফরাসি গ্রন্থ ফরাসি সাহিত্যে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রেঞ্চ ও জার্মানদের ভাষা, ভাব, দেশের প্রকৃতি, ইতিহাস ও ধর্মকর্মের যতটা ঐক্য আছে আমাদের সঙ্গে ইংরেজদির কি তার শতাংশ আছে।" সে না থাক, তবু আমরা নিজের পা খুইয়ে কাঠের পা পরেও নিবু-নিবু আলোয় পরম আহ্লাদে শরীর ঝাঁকাতে পারি। স্বল্পবাসে মডেল সাজতে পারি! আমরা প্রেসিডেন্সিয়ান! বাঙালী native নই!

এবার বুদ্ধিভ্রষ্ট অভিভাবকেরা শুনুন, "অন্য দেশে

একটা বড় কাজের যতটা মূল্য, আমাদের দেশে একটা অবিকল নকলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এতটা করিয়া যাহা হইল, তাহা যে কিছুই নহে, এ-কথা লোককে বোঝানো বড় শক্ত। এই জন্য মুখুর্যের ছেলেকে গড়গড় শব্দে ইংরেজি বক্তৃতা করিতে শুনিলে, বাঁড়ুয্যের ছেলেকেও সেই চূড়ান্ত গৌরব থেকে বঞ্চিত করিতে তাহার বাপের প্রবৃত্তি হয় না। তখন যদি তাহাকে বুঝাইতে বসা যায় যে, বার্ক, ব্রাইট, গ্ল্যাডস্টোনের ভাষার সহিত প্রচুর পরিমাণে পানাপুকুরের জল মিশাইয়া একটি বঙ্গশাবক যে বহু কষ্টে অথবা অল্পায়াসে গোটা কতক অকিঞ্চিৎকর কথা বলিয়া গেল, উহাতে কোন কাজ-ই হইল না, উহা না আমাদের দেশের অন্তঃকরণে স্থায়ী হইল না বিলাতী সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল—কেবল নিষ্ফল শিলাবৃষ্টির ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পট্‌পট্‌ শব্দের করতালি আকর্ষণ করিয়া শস্যবীজহীন পথকর্দমের সহিত মিলাইয়া গেল; উহা অপেক্ষা বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টারও সহস্রগুণ সফলতা আছে।" তবে রবীন্দ্রনাথ জানতেন এসব কথা বাঁড়ুয্যের কর্ণে স্থান লাভ করে না।

এই বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যের ইংগ-বঙ্গ শাবকদের প্রতি-পালনের দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন, আর সত্যি কথা বলতে গেলে পুলিশ ডেকে ভয় দেখিয়েছেন তাঁদের বলি, আপনারা যে এ বিষয়ে "আপত্তি করিবেন তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। যদি না করিতেন তবে আমাদের...এমন দুর্দশা হইবে কেন।...আজ আমরা ইংরেজের কল্যাণে যদিবা আপত্তি করিতে শিখিলাম, অভাগার অদৃষ্ট এমনই, অনেক সময়ই...মঙ্গল প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বসি।" কারণ বোধ হয় মাননীয় কর্তৃপক্ষের আপত্তি করাতেই এক ধরণের সুখ। নতুবা মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনই যে ছাত্রের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় না, একথা তাঁদের আন্দোলন করে বোঝাতে হয়?

রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল, "ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশু ওই বড় বড় বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্বুদের মত প্রতীয়মান হবে।" তবে তাঁর স্বাধীন দেশবাসী, মহান সরকার প্রতি বছর কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ করে সেই সৌধবুদ্বুদের নতুন রং লাগাবেন—রবীন্দ্রনাথ একথা আশা করেছিলেন কিনা জানি না। বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান করে বসে থাকা প্রেসিডেন্সি নামক সৌধ-বুদ্বুদের বিজাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যের সপরিবারে গলাবাজি করছেন করুন, ত্রি-বর্ষের নির্বাসন শেষে এই কলেজ থেকে এই লেখক রিক্ত-হাতে ফিরেছে।

স্বস্তি নেই

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

আমরা দক্ষিণ দিকে হাঁটছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আচমকা আমাদের মুখগুলি উত্তর দিকে ঘুরিয়ে দিল। সেই থেকে আমরা সবাই উত্তর দিকে চলেছি। দক্ষিণ দিকে ফিরতে বারবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কী ছিল আমাদের? বিশেষ কিছু ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা স্বাধীনতা ছিল না। সেই জ্বালায় আমরা জ্বলছিলাম। সেই জ্বলুনি অন্য ছোট-বড় অনেক জ্বালাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। সচেতন মনে যাদের ভুলে ছিলাম, অবচেতন মনে তারাই আশ্রয় পেয়েছিল। তাই স্বাধীনতার পর অবচেতন মন প্রতিশোধ নিচ্ছে, নিতে পারছে।

এতদিন পর পিছনের দিকে তাকালে সেই জ্বালা মনে পড়ে না। বরং আলোর ছোট-ছোট বিন্দুগুলি চোখের সামনে ভাসে। সে সময় আমরা বেশির ভাগ মানুষ সুখে ছিলাম না, কিন্তু স্বস্তিতে ছিলাম। সুখে ছিলাম না, কেননা থাকবার উপায় ছিল না। ম্যালেরিয়া ছিল, কালাজ্বর ছিল, টাইফয়েড হলে নার্সিং ভিন্ন অন্য কোন ভরসা ছিল না। মশা, মাছি, পুকুরে কচুরিপানা, বাজারে কাবুলিওয়ালা, কোনটারই অভাব ছিল না। পাঁচ টাকায় একমণ উত্তম চাল, পাঁচ সিকেয় এক সের গাওয়া ঘি, পাঁচ আনায় চন্দ্রৌসি আটার আড়াই সেরি প্যাকেট, দশ আনায় এক সের রুই মাছের পেটি অথবা মাংস, এক আনায় গোটা দুই হাঁসের ডিম, চল্লিশ টাকায় একভরি সোনা সব ছিল। কিন্তু সে-দিনও আমাদের বেশির ভাগ মানুষের কাছে এগুলি নামমাত্র ছিল। মফঃস্বলে একজন গ্র্যাজুয়েট স্কুল-মাস্টারের মাইনে ছিল তিরিশ টাকা। একজন সাধারণ দিন-মজুরের দৈনিক মজুরি ছিল এক টাকার সিকি ভাগ। দিনের বেলা যে দা-হাতে বাড়িতে কাজ করত, রাত্রে সেই হয়ত সিঁদ কাঠি হাতে ঘরে ঢুকত। থানায় গেলে যাওয়া-আসা হয়রানিই সার হত। এই সিঁদ-কাঠি সর্বদা মানুষের একচেটিয়া ছিল না। কখনও প্রকৃতি, কখনও ভাগ্য, সেটি নিজের হাতে তুলে নিত। খরা ছিল, বন্যা ছিল। প্রায় প্রতি পরিবারে তরুণী বিধবার দীর্ঘশ্বাস ছিল।

তবুও আমরা স্বস্তিতে ছিলাম। কেননা আমাদের অনেকেরই মাথার উপর নিশ্চিত আচ্ছাদন ছিল, পায়ের তলায় নিশ্চিততর মাটি ছিল। প্রতিবেশিকে আমরা হিংসা করতাম, ঘৃণা করতাম, ভয় করতাম, ভালবাসতাম। অর্থাৎ তার সঙ্গে সম্পর্কটা মানবিক ছিল। এখনকার মতো ইস্পাতে মোড়া ছিল না। আমরা অনেকে বেকার ছিলাম কিন্তু এমন বেকারী ছিল না। সমাজে ধন-বৈষম্য ছিল, কিন্তু তার এমন দাম্ভিক প্রকাশ ছিল না। সর্বদা একপ্রাণ-একতা না থাকলেও আমরা এক-জাতি ছিলাম। সেই একজাতির একটি দল ও একটি নেতা ছিল। প্রতিটি মানুষের একটি ভোট ছিল না, কিন্তু প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে একটি শত্রুতা, স্বদেশের প্রতি একটি আনুগত্য ছিল। স্বর্গে ঈশ্বর আছেন এবং দুনিয়াতে সব ঠিক চলছে এই বিশ্বাস আমাদের অস্তিত্বকে, মাটিকে ঘাসের মতন ঘিরে ছিল, ধরে ছিল।

সৃষ্টির আদিতে আদম আর ঈভ স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিল।

আমাদের দেশে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়েছি। স্বাধীনতার পর প্রাক্তন বিশ্বাসের দিকে ফিরে তাকাই নি। নতুন বিশ্বাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। পারি নি। পরিবর্তে, একের পর এক পাঁচটি যোজনা অতিক্রম করেছি। এগুলিতে আর যাই থাক, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফললাভের সাধনা ছিল না। শুরুতেই প্রথম ও শেষটিকে বর্জন করে স্লিভলেস ব্লাউসের মত শুধু বাকি দুটির জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়েছি। এইভাবে একদা যে বীজ বপন করেছি এখন তারই ফল ভোগ করছি। অনেক পরিবারে সুখ এবং সমৃদ্ধি এখন আগের তুলনায় বেশি। কিন্তু এই সুখ ও সমৃদ্ধি আমাদের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার রেখাগুলিকে দূর করতে পারে নি। বরং যত দিন যাচ্ছে, সেগুলি তত বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। সুখের চেয়ে স্বস্তি শ্রেয়, এই প্রবাদবাক্যটিকে আমরা ভুলে থেকেছি। তার চেয়েও ভয়ের কথা, এই স্বস্তিকে ফিরে পাবার মন্ত্রটিও আজ আমাদের মনে নেই। তাই ক্রীড়াচ্ছলে আমরা যে ব্যাঘ্রকে সৃষ্টি করেছি, যত দিন যাবে, তার আসফালন আমাদের তত প্রত্যক্ষ করতে হবে। তাকে পুনরায় মূষিক আকারে ফিরিয়ে আনতে আমরা বোধ হয় কোনদিন পারব না।

স্মৃতি ঃ চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ডুরেকাটা সিল্‌ক-পাতা মনস্বী পড়ুয়া দেবদারু—
পিছনে তামাম মাঠ বড়োসড়ো সবুজ পাপোষ এই প্রতিষ্ঠানে
সিংদরজা, মধুবনী গোঁফ, বাঁধানো চাতাল জুড়ে
দেশলাইবাক্সর মধ্যে দিয়ে চোখ চলে যায় শূন্য করিডোর,
আলো, ভাঙা বরফের চাঁই বিষম ত্রিভুজে, পড়ে আছে
মাড়াবার কেউ নেই, ঠেলে ফেলে দেবে ছাঁচে তেমন লোকের
অত্যন্ত অভাব, এই পড়ন্ত বিকেলে, সন্ধ্যার চৌকাঠে ঠেকে
জনশূন্য করিডোর, উত্থানপতনময় সিঁড়ির মারবেল, পড়ে আছে
দরোয়ান-টুঙি থেকে ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে, ঝরে বটফল
থেত্রান, সকালে সেখানে বসে ঘণ্টা শোনে ধীমান ধীমতী
ক্লাসরুম ভরে যায় মৌমাছিতন্ত্রের মন্ত্রপাঠে
মণি পদ্‌মে হুং ওঁ মণি পদ্‌মে···
ঢাকা বারান্দার খোলে চাকা কাদামাটি নিয়ে আসে
বুড়োসুড়ো কাঁচা ঘাস ফেলে যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে
মনান্তরের মত দাগ, গাড়ী ঝেড়ে যায় উৎক্ষিপ্ত পেট্রোল
স্বাভাবিকতার মাত্রা ঠিক রাখতে প্রাণপণ করে
নিজের সন্ততি এনে সেই পুরাতন ঘরে, বেন্‌চে বসাতে
সাধ হয়। যেন বসে, যেন কাটে পেন্‌সিলকাটার
ছুরিতে নিজের নাম হাইবেন্‌চ, দেয়াল, পাথরে।
সাধ হয়, দেবদারু ছায়ার ভিতরে, থেত্রানে, বসে কয় বরষাপীড়িত
সেদিন মনের কথা
মেঘের চাঁদোয়া ফুটো, বৃষ্টি পড়ে সবুজ ছাতায়
পিছনে দেবদারু ফল রাস্তা মরামের শেষে উজ্জ্বল বীজের
আগুনের ফলা টেনে বের করে গাছ হবে বলে।
গাছ হয়!

মৃত বন্ধুর জন্য

শঙ্খ ঘোষ

এবার আমাদের শান্ত উৎসবে
তোমার নামে কোনো আসন নেই
এবার অর্জুন কিংবা সেগুনের
পায়ের নিচে শুধু প্রাচীন ধ্বস
সেখানে অবনত মুখের টেরাকোটা
এভাবে ভেঙে যাবে তা ভাবে নি ও
তুমি যে নেই আজ সেটাই স্বাভাবিক
তুমি যে ছিলে সেটা অভাবনীয়।

খোলামকুচিগুলি দু'হাতে তুলে নিলে
আকাশও হয়ে ওঠে শিলালিপি
সময় থেমে যায় বুকের কাছে এসে
মাটিতে পড়ে থাকে আধা বিকেল
তখন আমাদের নিঃস্ব স্মৃতিভার
যেভাবে দিতে চাই সেভাবে নিয়ো
তুমি যে নেই আর সেটাই স্বাভাবিক
তুমি যে ছিলে সেটা অভাবনীয়॥

যন্ত্রণা নেই

শৌভিক মজুমদার

ঝুরঝুর পাতাদের ফাঁক থেকে তৃপ্তি ঝরে পড়ে,
পুকুরের ধার ঘেঁষে শুয়ে আছে নির্জনতা।

এখন যন্ত্রণা নেই।
টলমলে ছবিদের গালে
জমে আছে ভালোবাসা,
শুয়ে আছে চুপচাপ সবুজ জলজ মনে।

লালচে ভেজা সিঁড়ি মেখে আছে
টলটলে ঘুম —
ঝাঁঝির জঙ্গল ছুঁয়ে গেল দু'একটা এলোমেলো ঘাই।

এখানে স্বপ্ন আছে।
ঝুঁকে-পড়া কুলগাছ, অন্ধকার জলে
শুয়ে আছে সবুজাভ ছোটখাট পাতা।
কোনোকালে পড়ে-থাকা এক ফোঁটা ঘাস
জেগে আছে চুপচাপ।

আকাশে নীলাভ রোদ,
ঢেউ-ঢেউ মেঘেরা মেখে আছে ঘুম।
এখানে নির্জনতা — স্বপ্ন —
যন্ত্রণা নেই।

আত্মঘাতী বনস্থলীর গান

T. S. Eliot-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

[আমি ক্ষীণ, শব্দহীন, সুশোভন প্রত্যয়বিহীন···
It's impossible to say just what I mean]

এভাবে পারিপার্শ্বিক আয়নাগুলি মাড়াতে মাড়াতে
আমরা হেঁটে যাই সেই সমুদ্রের দিকে —
সমুদ্র? না, নির্জন সেই বিস্তৃতির কাছে,
যেখানে শব্দময় হয়ে ওঠে তৃপ্তিহীন পরাভবগুলি?
স্থিত হই! নির্জনতা কথা বলে। গূঢ়তর প্রশ্ন আসে ফিরে···
জানা যায়, তেমন কোনো ব্যক্তিগত বিস্তৃতিও ছিলোনা কোথাও,
ঈশ্বর ছিলোনা কোনো দূরলিপ্ত স্মৃতির প্রাচীরে!

কেননা, পরিপার্শ্ব জুড়ে প্রসারিত আয়নাসমূহ,
সময়ের অক্ষরবৃত্তে যাকে অনেকে বাস্তবতা বলে,
আমাদের কারো জন্যে রেখে দেয়নি কল্পনার ততটা অবকাশ —
ততটা হাত-পা-খুলে আরামে ভেসে যাওয়ার নিশ্চিন্ত কল্পলগন
আমাদের প্রতিবিম্বে পড়ে থাকে অসুস্থতা, নোংরা পথ, এবং সে পথে
সহনশীলতা নিয়ে, নাক চেপে, যতদূর হেঁটে যাওয়া যায়,
দেখা যায়—সমুৎসুক রোদ্দুরের পাশাপাশি পড়ে আছে বমি
পৃথিবীতে; আকাশের তথাকথিত বিস্মরণ অস্বীকার করে!

দেখা যায়—ডুবে আছে পথঘাট সে-প্রাচীন বিবমিষা নিয়ে
যেরকম বমনেচ্ছা জেগে ওঠে কখনোবা একা
সেইসব বুড়োদের, সেইসব ছেলেমেয়েদের,
অদ্ভুত ধোঁয়ার মধ্যে ঘরে, কিংবা চায়ের দোকানে,
(বাহিরে রয়েছে খুব মৃদু আলো, ভিতরের লোড্‌শেডিং-এর
যথাযথ পরিবর্তের মতো স্ববিরোধী যার অধিকার,
যে আলোর মায়াবাষ্পে সব ধোঁয়া, সব রুগ্ন সংশয়, পেয়েছে নীলিমা!)
যেখানে ছড়িয়েছিলো পীতাভ রেটিনাগুলি
কোনো স্থির উষ্ণতার খোঁজে,
সেইখানে, যারা শুধু সময় কাটাবে বলে একমাথা অভিমান নিয়ে বসে আছে!
প্লে-ব্যাক্ সুরের মতো বাস্তবতা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে···

আমরাও জেনেছি এই অভিমান!
আমাদেরও মগজের আত্মঘাতী বনস্থলে গান
গেয়েছিলো সেই পাখি—যার শব হারিয়েছে কবে ইতিহাসে।
সেই গানে আমরাও চাতকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খুঁজেছি আরাম।
প্রথানুসারী মননে, অবিকল পড়েছি দর্শন।
সাময়িক আয়নায় তখনি আবার সব স্মৃতি-সত্তা প্রতিফলনের
অন্তঃসলিলা পথে প্রবাহিত হ'য়ে গিয়েছিলো···
ক্রমশ হয়েছি ক্ষীণ, শব্দহীন, সুশোভন প্রত্যয়বিহীন;
আমরাও জেনেছি কোন্ অভিমানে রোজরোজ সন্ধ্যা এসে ঢেকে দেয় দিন,
এবং কী অভিমানে পুনর্বার রোদ চায় মানুষের যান্ত্রিক শরীর!

অথচ, জীবন মানে, মনে হয়, শুধু নিছক সময় কাটানো!
আর কিছু নয়!
বাস্তবের অভিঘাতে যেরকম দেখা গেছেঃ রবিবার থেকে বরিবার —
এইভাবে শেষ হ'য়ে যায় প্রেম, ইতিহাস, মানবসংসার···
এইভাবে বারবার অনিচ্ছুক পা দু'টিকে সময়ের দর্পণে হাঁটানো —
আর কিছু নয়।
যাবতীয় প্রতীক্ষার করিডরে, স্মৃতিদের নষ্ট শব ঘেঁটে ঘেঁটে ঘেঁটে
প্রতিফলনের খোঁজে সময় কাটানো—তাকে বেঁচে থাকা বলে!

অতএব ঘুম পায়। আত্মঘাতী তন্দ্রায় পাখিরাও হ'য়ে যায় স্মৃতি!
প্রতিফলনের মধ্যে অনুদার পড়ে থাকে তাদের হারানো ঠোঁটগুলি।
কুড়োই। সন্দেহবশে ফেলে দিই ছায়াময় দিগন্তের দিকে।
ফেলি যে, কোথাও কোনো পতনের শব্দ কিছু নেই···
কোনোখানে প্রত্যাশিত প্রতিধ্বনি নেই···
ততক্ষণে সে পতন বহুদূর স্মৃতি হ'য়ে গেছে।

এভাবে স্বপ্নচারী পরাভবের বনস্থলে জেগে থাকে যে-একাকী সাপ
প্রাকৃত ঘুমের কফে ঢাকা পড়ে তার দেহ···
প্রাকৃত ঘুমের কফে বিস্বাদ হ'য়ে যায় মানুষের স্বাদু স্বকীয়তা!
শুধু সেই আচরিত পরিপার্শ্ব কল্পনায় করে প্রতিধ্বনি।

রোদ্দুরের জিঘাংসায় আশরীর ডুবে থাকে আধো-জাগরূক মানুষেরা,
কল্পনার ব্যক্তিগত পথে ঘাটে পড়ে থাকে বাস্তবের বমি!

কথা ছিল

মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

ক্ষমা কোরো।
কথা ছিল, বাইরে থেকে
কামান দেগে উড়িয়ে দেব
কঠিন প্রাচীর,
ফুটিয়ে দেব শ্বেতপদ্ম,
শুকনো ঘাসের মর্মমূলে।
সেই কথা আজ হালকা হাওয়ায়
পথের 'পরে ভেসে বেড়ায় —
ক্ষমা কোরো।

কথা ছিল, সাপের চোখে,
জ্বালিয়ে দেব হলদে আলো,
মগ্ন মণির দমকা ছোঁওয়ায়
রাজকুমারী উঠবে জেগে।
সেই কথা আজ পুকুর পাড়ের
শ্যাওলাপাঁকে ডুবে গেছে
ক্ষমা কোরো।

কথা ছিল, সিক্ত সেতু
পেরিয়ে আমি পৌঁছে যাব
নীল দরিয়ার মধ্যিখানে,
পানকৌড়ির গায়ের পালক
আনব চেয়ে, ঢাকব আকাশ
সেই কথা আজ
বাজনদারের ঢাকের সুরে
হারিয়ে গেছে —
ক্ষমা কোরো।

কথা ছিল সাত প্রেয়সীর
গলায় দেব মুক্তোমালা
সবুজ বনে পাতব আসর,
জ্যোৎস্না দিয়ে গড়ব কুটির;
সেই কথা আজ
শাল-মহুয়ার
পাতার সাথে খসে গেছে,
ক্ষমা কোরো॥

নবজন্ম

(ইয়েট্‌স্‌ থেকে অনুবাদ)

নন্দিনী বসু

আমি দেখেছি তাদের দিনের শেষে,
দেখেছি তাদের শীর্ণ উজ্জ্বল মুখ,
আসছে তারা শতাব্দীর ভারে অন্ধকার
অফিস বাড়িগুলো থেকে।
দেখা হলে পাশ কাটিয়ে গেছি
কিংবা অল্প হেসে ভদ্রতা করেছি
বলতে হয়েছে কতগুলো অর্থহীন কথা
(কি? কেমন আছেন? ছেলেমেয়ের খবর কি?)
ক্লাবে কিংবা ঘরে পরনিন্দা পরচর্চা করেছি
(জানেন তো সেই মেয়ের খবর? আরে মশায় কে না জানে।)
আড্ডা উঠেছে জমে
বুঝেছি তারা এবং আমি
বেঁচে আছি দিনের পর দিন শুধু বাঁচার জন্য
অর্থহীন ভাবে।
বদলে গেছে বদলে গেছে সবই
পুরাতনের মৃত্যু হ'ল আজ
জন্ম নিল ভীষণ সুন্দর॥

দৈনন্দিন জীবনের মাঝে
অতি সাধারণ একটি মেয়ে
যার চিল চিৎকারে টুকরো টুকরো
হয়েছে রাতের অন্ধকার
সেই নারীই হয়ে উঠেছে অনুপম
তারই মাঝে আমি দেখেছি প্রকৃত সুন্দর।
ওই যে নিতান্ত সামান্য
খেটে খাওয়া স্কুল-মাস্টার

সেও এগিয়ে এসেছে
গেয়েছে জীবনের জয়গান
সেদিন তুলনা পাইনি তার।
ওই যে মদখোর লম্পট
এতদিন যাকে ঘৃণা করেছে
আমার সমস্ত অন্তর
আমার গানে তারও রয়েছে স্থান
তারও জীবন-নদীতে উঠেছে নতুন সঞ্চার
সেও বদলে গেছে।
পুরাতনের মৃত্যু হ'ল আজ
জন্ম নিল ভীষণ সুন্দর॥

*　　*　　*　　*

কতদিন কতকাল এই বুক-ফাটা যন্ত্রণা
কবে শেষ হবে মৃত্যুর দিকে এই অনন্ত যাত্রা?
আমি জানি না
শুধু জানি ছুটে যেতে হবে উদ্দাম বেগে
যতক্ষণ না নেমে আসে
রাতের ক্লান্ত ছায়া
মৃত্যুর নিশ্চিত বিশ্রাম।
এত হাহাকার, এত বলিদান তবে কি ব্যর্থ সবই
উদ্দীপ্ত ব্রিটিশ-সূর্য হয়নি তো ম্লান
তবে কি নিষ্প্রয়োজন এই মৃত্যু?
মিথ্যা এই ত্যাগ?
ওদের স্বপ্ন তো মিথ্যা নয়
তবুতো ওরা স্বপ্ন দেখেছে
মৃত্যু বরণ করতে পেরেছে
নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে
এত ভালবাসতে পেরেছে।
আমার কবিতায় লিখি তাদের নাম —
ম্যাকডোনাগ, ম্যাকব্রাইড
কনোলী, পিয়ার্স
ওরা সবাই বদলে গেছে
বদলে গেছে বাহির অন্তর।
পুরাতনের মৃত্যু হল আজ
জন্ম নিল ভীষণ সুন্দর॥

[১৯১৬ সালে ইস্টার সপ্তাহে অনুষ্ঠিত আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিপ্লব উপলক্ষ্যে ইয়েট্‌স এই কবিতাটি রচনা করেন। ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আইরিশদের এই বিপ্লব সফল হয়নি। ইয়েট্‌স্‌ এই বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না। এমন কি এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবু বিপ্লবীদের বীরত্ব এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগ তাঁকে অভিভূত করে।

ইয়েট্‌স্‌ চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন। তাঁর কবিতায় তিনি সৌন্দর্যের ধ্যান করেছিলেন। তিনি মনে করতেন শিল্পের মহত্ত্বের মাধ্যমে আমরা জীবনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করতে পারি। তাই শিল্পকে তিনি জীবনের উপরে স্থান দিয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুটা escapist ধরণের মনোবৃত্তি পোষণ করতেনঃ সাধারণ দৈনন্দিন জীবন কুৎসিত, অসুন্দর; তাই বাস্তব জীবন থেকে সরে না এলে কবিতা রচনা সম্ভব নয়।

কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের এই বিপ্লব দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি উপলব্ধি করেন সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও মহত্ত্বের, সৌন্দর্যের জন্ম হতে পারে। তিনি দেখেছেন এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অতি সাধারণ মানুষও তার তুচ্ছতা, তার নগণ্যতা, তার জীবনের অর্থহীনতাকে অতিক্রম করে অনুপম হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝেছেন এই সৌন্দর্য বাস্তব থেকে দূরে সরে এসে পাওয়া যায় না। বাস্তবের মধ্যেই এর জন্ম। এই কবিতাটিতে তিনি এই ভীষণ সুন্দরের জন্মের জয়গান গেয়েছেন।

আমি আমার অনুবাদে কবিতার তৃতীয় stanzaটি বাদ দিয়েছি।]

পলাতক

ভবানীপ্রসন্ন চক্রবর্তী

ভূতত্ত্ব নিয়ে পাশ করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নানা কোম্পানির হয়ে ঐ বিষয়ে কাজ করে আসছিলাম। এ কাজে দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে পাথর পরীক্ষা করতে হত; অনেক জন্তু-জানোয়ারের সংস্পর্শেও আসতে হত। তাছাড়া জঙ্গলে কাজ করেন এমন অনেক লোকের সঙ্গেও আলাপ হত।

উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যের রাজার আত্মীয় লালুবাবুর নাম অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি। তিনি অসংখ্য বাঘ মেরেছিলেন—সবই মানুষখেকো বাঘ। লোকের মুখে তাঁর নাম কিংবদন্তী হয়ে পড়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে বাঘের সামনে পড়লে লালুবাবুর নাম উচ্চারণ করলেই বাঘ পালাবে। একবার লালুবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর শিকারের কয়েকটি ঘটনা তাঁর মুখে শুনলাম। লালুবাবু বলেছিলেন, প্রত্যেকটি বাঘ তিনি মাথায় গুলি করেই মারতেন। মাথায় গুলি করে মারা শিকারীর পক্ষে গৌরবের; কিন্তু জিম করবেট এক বইতে লিখেছেন যে, মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারতে কখনো মাথায় মারা উচিত নয়, মাথায় ঠিক মত লাগলে বাঘ তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়বে ঠিক, কিন্তু ঠিকমত না লাগলে বাঘ শিকারীকে মেরে ফেলবে। লালুবাবু কিন্তু বললেন যে, তাঁর পক্ষে মাথায় মারতেই সুবিধে হয়—সামনের দিক থেকে মারলে কপালে দুই চোখের মাঝখানে, আর পাশ থেকে মারলে কানের এক ইঞ্চি নিচে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে বাঘ বিদ্যুতগতিতে লাফিয়ে পড়লে বা দৌড়ালে তাকে ঠিক জায়গায় মারা কী করে সম্ভব? তিনি বলেন সবই অভ্যাসে হয়; ছ-বছর বয়েস থেকেই রাইফেল ছুঁড়ছেন, হাতের বুড়ো আঙুলে একটা সিকি রেখে টোকা দিয়ে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে মাটিতে পড়বার আগেই রাইফেলের গুলি করে উড়িয়ে দেওয়া অভ্যাস করেছেন। তাঁর মতে নার্ভাস না হয়ে স্থির থাকা, বিদ্যুতগতিতে কর্তব্য স্থির করা এবং নিখুঁত লক্ষ্যভেদ—এই কয়টিই শিকারের সাফল্যের কারণ।

লালুবাবুর মুখে যেসব কাহিনী শুনছি তার একটি তাঁর নিজের জবানীতেই লিখিছি। ঘটনাটি ১৯৪০ সালের আগের।

"একবার রাজাসাহেব তাঁর এক ক্যাম্পে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি রাজাসাহেবের পাশে এক ইংরেজদম্পতি। পরিচয় করে দিয়ে রাজাসাহেব বললেন যে ওঁরা তাঁর বন্ধু, বাঘ শিকার করতে এদেশে এসেছেন। একটু আগেই তিনি খবর পেয়েছেন ওখান থেকে ছ'-মাইল দূরে এক গ্রামে বাঘ একটি লোককে মেরেছে, আমি যেন কাল ভোরেই সেখানে গিয়ে সুবিধা মত জায়গায় মাচা তৈরী করে খবর দিই যাতে ইংরেজ-দম্পতি সেখানে বসে বাঘ শিকার করতে পারেন।

সেখানকার রাস্তা আমার জানা ছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তায় ছ'মাইল গেলে সেই গ্রামে পৌঁছাব। আমি রাত একটায় রাইফেল এবং টর্চ নিয়ে একাই রওনা হলাম। নেহাত প্রয়োজন না হলে টর্চ জ্বালতাম না। কিছু রাস্তা চলার পর

হঠাৎ যেন একটা নরম বস্তার উপর পড়লাম। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালতেই দেখলাম একটা ভাল্লুক! ভাল্লুকটা উঁইয়ের গর্তে মুখ ঢুকিয়ে উঁই খাচ্ছিল।

গ্রামে গিয়ে শুনলাম আগের দিন দুপুরে তাদের গ্রামের এক রাখাল ছেলেকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। কয়েকজন সাহসী লোককে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলাম শরীরটা সেখানে নেই। রক্তের দাগ অনুসরণ করে কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে শরীরটা দেখা গেল। একরাত্রের মধ্যেই শরীরের সব মাংস খেয়ে কেবল মাথাটা বাকি রেখেছে। মাথাটা খেতে বাঘ আর আসবে না বুঝে মাচা বানান নিরর্থক মনে করলাম। বাঘটার গতিবিধি দেখবার জন্য পায়ের ছাপ অনুসরণ করে একটা নালার ধারে এলাম। নালায় প্রবল স্রোতে জল বইছে। নালার ধারে একটু হাঁটার পর একটা ঝোপের মধ্য থেকে একটা বাঘ প্রচণ্ড গর্জন করে তীরবেগে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলো। মুহূর্তে রাইফেল তুলে গুলি করলাম; মাথায় গুলি লেগে বাঘটা আমার থেকে কয়েক হাত দূরে লুটিয়ে পড়লো।

রাখাল ছেলেটার দেহাবশেষ সৎকারের জন্য নিয়ে গেল। বাঘটাকে একটা লম্বা গাছের ডালে বেঁধে কয়েক-জন লোক দিয়ে বইয়ে রাজাসাহেবের ক্যাম্পে রওনা হলাম। আমাকে বাঘ নিয়ে আসতে দেখে রাজাসাহেব উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করে উঠলেন—"বাঘটাকে তুমিই মেরে নিয়ে এলে?" আমি বললাম বাধ্য হয়েছি মারতে। রাজাসাহেব রাগে যেন ফেটে পড়বেন! বললেন, "এঁরা বিদেশ থেকে এতদূরে এসেছেন বাঘ মারতে, আর তুমি নিজেই মেরে সব আনন্দ নষ্ট করলে?" তখন আমি সব অবস্থা বোঝালুম, ওখানে যে মাচা-শিকার হত না তাও বললাম, আর কি অবস্থায় পড়ে আমি গুলি ছুঁড়েছি তাও বললাম। প্রত্যক্ষদর্শী কুলিরা বাঘ বয়ে এনেছিল, তারাও বললো যে, ঐ অবস্থায় গুলি না করলে আমার মৃত্যু হ'ত। রাজাসাহেব গুম হয়ে বসে রইলেন; আমিও ক্যাম্প থেকে চলে এলাম। তারপর কয়েকদিনই রাজাসাহেবের সঙ্গে দেখা হল; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন না।

কয়েকদিন পর রাজাসাহেব ফের আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি লেগে তিনি বললেন যে, তিনজন মিলি-টারী সাহেব আসবেন শিকার করতে। সব রকমের শিকার পাওয়া যায় এমন এক জঙ্গল নির্বাচন করে সেখানে তাঁদের থাকার উপযুক্ত ক্যাম্প বানাতে হবে এবং শিকারের সবরকম বন্দোবস্ত করতে হবে। আমি শিকারের উপযুক্ত জায়গার নাম বললাম, রাজাসাহেবও তাতে সম্মতি দিলেন।

আমি সেখানে গিয়ে বন্দোবস্ত আরম্ভ করলাম। সেখানে আমাদের ছোট একটা ক্যাম্প ছিল। তার পাশে জায়গা পরিষ্কার করে একটা পাঁচ-কামরা ক্যাম্প বানালাম। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে বাথরুম, বাথটব বসান হ'ল; সিমেণ্ট-পলস্তারা দেওয়া মেঝে, গালিচা বিছান। বাবুর্চিখানা এবং আরও তিন-চারখানা ঘর হল। আমি রাজাসহেবকে জানিয়ে দিলাম। তিনি জানালেন কাল তাঁরা সবাই আসবেন ক্যাম্পে। ফার্নিচার, খাবারের আর শোবার জিনিস-পত্র আজই পৌঁছে যাবে। কালই প্রথম শিকারের বন্দোবস্ত যেন করা থাকে। আমি পরের দিন হাঁকা-শিকারের জন্য দু' হাজার কুলির বন্দোবস্ত করলাম। জানোয়ারের চলার পথে গাছের ডালে তিনটি মাচা করলাম, সেখানে কোন কুলি থাকবে না; আর সমস্ত জঙ্গলটাকে ঘিরে কুলিরা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে চিৎকার করতে-করতে এগিয়ে আসতে থাকবে যেন জানোয়াররা মাচার দিকে আসে। সব বন্দোবস্ত করে রাত্রে ঘুমতে গেলাম।

শেষ রাত্রে জেগে গেলাম। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই শিকার শুরু। উঠে চা খেলাম। শুনতে পেলাম ক্যাম্পের খুব কাছেই একটা বনমোরগ ডাকছে। ওটাকে মারবার খুব ইচ্ছে হল। বন্দুক ছাড়া বনমোরগ শিকার সুবিধা হয় না; কিন্তু আমার কাছে আছে শুধু একটা রাইফেল, ওটা নিয়েই রওনা হলাম। টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে; কালো রং-এর একটা বর্ষাতি এবং মাথাঢাকা টুপি নিলাম—ইচ্ছা একটু বেড়িয়েই দেখা দেখা যাক। আমাকে বেরতে দেখে আমাদের চাকর কালুও আমার সঙ্গে চললো। তখন ঊষার আলো বেশ ফুটে উঠেছে; মোটর-রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়েই দেখলাম একটা সরু বনপথ মোটর-রাস্তায় এসে মিশেছে।

একটু তাকাতেই দেখলাম একটা বিরাট বাঘ হেলে-দুলে বনপথ দিয়ে আসছে। বহু বাঘ শিকার করেছি, কিন্তু এতবড় বাঘ কখনো দেখি নি। মাথাটা একটা বড় থালার মত। লোভ হল; কিন্তু আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিদেশীরা শিকারে আসবেন, এখন যদি এ বাঘ আমি শিকার করি তাহলে রাজাসাহেব আমার রক্ষা রাখবেন না, মাত্র পনেরদিন আগে এরকম অপ্রীতিকর অবস্থা হয়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ কালুকে টেনে টেনে নিয়ে রাস্তার মোড়ে ঝোপের আড়ালে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, কালুকে আমার ঠিক পিছনে রাখলাম। বাঘটা এসে মোটর-রাস্তার মোড়েই দাঁড়িয়ে পড়ে সামনের দিকে দেখতে লাগলো। বন ছেড়ে খোলা জায়গায় এলেই বাঘ একবার সামনে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে আরম্ভ করে। বাঘটা আমার থেকে মাত্র দু' ফিট দূরে, কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়েছে বলে আমায় দেখতে পায় নি। আমি ঠিক আগের মতই তাক করে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন শব্দ না হয় এবং বুক উঁচু নিচু না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখলাম। ভয় হল কালু আবার না শব্দ করে ফেলে। কালু দুবার আঙ্গুল দিয়ে আমার পিঠে খোঁচাল, অর্থাৎ গুলি করতে ইসারা করলো। আমার ভয় হল বর্ষাতিতে আঙ্গুলের খোঁচা লেগে শব্দ হলে বাঘ ফিরে চাইবে। কিন্তু আমি রাইফেল ধরে মূর্তির মত স্থির হয়ে রইলাম। একটু পরেই বাঘটা ফের হাঁটতে শুরু করলো, আমার মনে স্বস্তি এলো। কিন্তু বাঘের লেজটা এপাশে ওপাশে দুলতে একবার আমার পায়ে লাগলো। অস্বাভাবিক স্পর্শ পেয়ে বাঘটা ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখেই ঘুড়ে আমার দিকে মুখ রেখে তাকাল। আমি তখনো ঠিক আগের মতই রাইফেল তাক করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাঘ তখন আমার থেকে মাত্র দু'হাত দূরে! কালো বর্ষাতিতে সারা শরীর-ঢাকা আমাকে স্থির হয়ে দাঁড়ান দেখে বাঘটা বোধ হয় আমি ঠিক মানুষ কিনা তা বুঝতে পারছিল না। মিনিটখানেক বাঘটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, আর আমিও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বুক না কাঁপিয়ে, শব্দ না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কালু আমার মোটা বর্ষাতির আড়ালে ছিলো বলে বাঘ তাকে দেখতে পায় নি। এক মিনিট এইভাবে থেকে বাঘটা দাঁড়িয়ে থেকেই বিরাট গর্জন করলো। বাঘের পেটের বিকট দুর্গন্ধ হাওয়া আমার নাকে ঢুকলো, থুতু আমার সারা মুখে লাগলো; কিন্তু তবুও আমি ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বাঘটা বোধ হয় মনে করলো আমি মানুষ নই, পোড়া কাঠ বা ঐ জাতীয় কিছু; কারণ মানুষ হলে অত গর্জনে না নড়ে পারত না। তাই সে ফিরে চললো। আমার মনে স্বস্তি এলো। কিতু হাত দশেক গিয়ে থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তখন আমার মনে হয় হল সে আবার ফিরতে পারে; কারণ সন্দেহ থাকলেই বাঘ ফিরে তাকায়। আমি ঠিক সেই রকম রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বাঘ আবার ফিরে চললো। মোটর রোডের একটা বাঁক পার হয়ে গেলে আমি তার শরীরের একটু অংশ ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে লাগলাম; তারপর সে ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গেলে কালুকে একটু ঠেলা দিয়ে ক্যাম্পের দিকে চলতে বললাম। তারপর সে নড়ছে না দেখে তার দিকে তাকিয়ে দেখি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে। একটু ঝাঁকি দিলে তার মুখ থেকে আওয়াজ বেরুল—'বা-বা-বা'। আমি তাকে টেনে ক্যাম্পে নিয়ে গেলাম। বেশ কতক্ষণ পরে তার মুখ থেকে একটু একটু কথা ফুটলো। কিন্তু যে সাংঘাতিক মানসিক আতঙ্কে সে পড়েছিল তার দরুণ স্বাভাবিক হতে তার বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল।

বেলা ন'টায় শিকার পার্টি এসে পৌঁছাল। ক্যাম্পের সকলের থমথমে ভাব দেখে রাজাসাহেব আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমার সকল কথা শুনে মিলিটারী সাহেবদের চক্ষু ছানাবড়া! রাজাসাহেব বলে উঠলেন আজ আর কোন শিকার নয়, শুধু বাঘ শিকার হবে। সবাই রাজি। হাঁক-কুলিদের বলে দিলাম তারা দু' মাইল জঙ্গলটা প্রথমে ঘিরে ফেলবে, তারপর ক্যানেস্তারা পিটিয়ে চিৎকার করতে করতে ক্রমশ মাচার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা মাচার দিকে রওনা হলাম। রাজাসাহেব আমাকে বললেন যে, কথা বলে তিনি

বুঝেছেন যে মিলিটারী অফিসারদের শিকারের অভিজ্ঞতা নেই। তাই তাদের একা মাচায় বসতে দেওয়া যেতে পারে না। রাজাসাহেব ও ভাইসাহেব দুজনকে নিয়ে বসবেন; সবচেয়ে বোকাটা থাকবে আমার সঙ্গে।

আমরা গিয়ে মাচায় বসার কিছুক্ষণ পরেই হাঁকা শুরু হ'ল। বিকট চিৎকার করে ক্যানেস্তারা পিটতে-পিটতে কুলিরা আমাদের দিকে এগুতে লাগলো। সব দিকেই চিৎকার কেবল আমাদের মাচার দিকটা নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরেই কয়েকটা হরিণ আমাদের মাচার কাছ দিয়ে চলে গেল। তাদের দেখে সাহেব গুলি করার জন্য রাইফেল তুলতেই আমি চেপে বললাম 'আজ কেবল বাঘ'। ক্রমে অনেক জানোয়ার চলে গেল। কুলিরা অর্ধেক রাস্তা এসেছে এমন সময় ওদের চিৎকার ছাপিয়ে বাঘের বিরাট গর্জন শুনতে পাওয়া গেল। আমি রাজাসাহেবকে চিৎকার করে বললাম যে, বাঘ নিশ্চই কোন কুলিকে জখম করে লাইন ভেঙ্গে পালিয়েছে; এ ভয়, ক্রোধ বা বিরক্তির গর্জন নয়, আক্রমণের গর্জন—আজ আর বাঘ পাবার আশা নেই। কিছুক্ষণ পরে খবর এলো আমি যা বলেছি তাই ঠিক; আর যে বাঘটা পালিয়েছে তার মত বড় বাঘ নাকি কুলিরা জীবনে দেখেনি। বাঘ পালিয়ে গেল, আর নিয়ে গেল একজন কুলিকে তার পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।"

'মালিনী' ঃ পুনর্মূল্যায়ন

তপোব্রত ঘোষ

পরিণত প্রজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ মানবব্রহ্মবাদী। 'নিখিল পৃথিবী' ও 'নিখিল ইতিহাসলোক' অতিক্রম করে 'আত্মিকলোকে-সর্বমানবচিত্তের মহাদেশে' জন্মগ্রহণই তাঁর মতে 'মানুষের ধর্ম'। ভাষান্তরে একেই বলা চলে ব্যক্তিসীমা থেকে বিশ্বসীমায় মানবচৈতন্যের উত্তরণ। নিজের এই ধর্মবোধের কথা বলতে গিয়ে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধনা একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা।...আমি ইস্কুল পালানো ছেলে। যেখানে গণ্ডী দেওয়া হয়েছে, সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো, তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম।"

'মালিনী' রচনার কয়েকমাস আগে লেখা ছিন্নপত্রাবলীর দু'টি চিঠি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। ২৩৮ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "ঠিক যাকে সাধারণতঃ ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারিনে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি।...শাস্ত্রে যা লেখে, তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারিনে, কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী—বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়।" ২৩৬-সংখ্যক পত্রে এই বক্তব্যকেই বিশদ আকারে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই, সে কখনো আমার ধর্ম হ'য়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হ'য়ে আসে। যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টালাইজ্‌ড্ হ'য়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ।...সেই জিনিসটাকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নিজের শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়।" রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ধর্ম কোনো 'বাইরে থেকে পাওয়া' শাস্ত্রীয় ধর্ম নয়, তা একান্তভাবেই মানবধর্ম। এই মানবধর্মেরই শেষ কথা হ'ল প্রেমের ধর্মঃ 'সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত'।১

এই তত্ত্বেরই নাট্যরূপ 'মালিনী'। জন্মসূত্রে মালিনী পেয়েছিল হিন্দুধর্মের সংস্কার। কাশ্যপশিষ্যা গুরুর কাছে গ্রহণ করেছিল বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা। কিন্তু কোনোটিই তার নিজের প্রাণলোকে পরম সত্য হ'য়ে ওঠে নি। সুপ্রিয়কে ভালোবেসেই সে পেল তার প্রাণের ধর্ম, এই প্রেমের ধর্মের জয়ধ্বনিই 'মালিনী'র মর্মান্তিক পরিণতির অপূর্ব রসমোক্ষ রচনা করেছে।

২

মূল বৌদ্ধকাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রসৃষ্ট নাট্যরূপের তুলনা করলেই 'মালিনী' নাটকে উচ্চারিত মানবধর্মের

স্বরূপ উন্মোচিত হবে। মহাবস্তুবদানের অন্তর্গত 'মালিনীবস্তু' থেকেই 'মালিনী' নাটকের আখ্যানভাগ গৃহীত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'মালিনী' রচনার প্রায় তিন বৎসর আগে ইন্দিরাদেবীকে লেখা ছিন্নপত্রাবলীর ৮৬-সংখ্যক পত্রে দেখা যাচ্ছে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থটি শিলাইদহবাসকালে কবির নিত্যসঙ্গী ছিল। এই গ্রন্থটি থেকে প্রত্যক্ষ-ভাবে রবীন্দ্রনাথ যেসব কবিতা ও নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার একটি আভাস পাওয়া যায় কবি-পঠিত ও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত গ্রন্থটির প্রথমেই তাঁর স্বহস্তলিখিত তালিকা থেকে। ঐ তালিকার মধ্যে 'মালিনী'র নামও মেলে।২ কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাবস্তুবদানের সুদীর্ঘ 'মালিনীবস্তুর' একটি অতি-সংক্ষিপ্ত রূপই রাজেন্দ্র-লালের গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এর অন্তত অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে হজসন নেপাল থেকে সংস্কৃত-বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন। 'মালিনী' রচিত হওয়ার আগেই সম্পূর্ণ মহাবস্তুব-দানের একাধিক পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়ে গিয়েছে। এর মধ্যে E. Senart কৃত অনুবাদটি খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৮৪০ শকাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী "বৌদ্ধ মহিলা রাজনন্দিনী মালিনী" শীর্ষক নিবন্ধে মালিনীর জীবন সম্পর্কে কিছু ভিন্ন প্রকার তথ্য প্রকাশ করেন। কাজেই সম্পূর্ণ 'মালিনীবস্তু' রবীন্দ্রনাথের অজানা থাকার কথা নয়।

'মহাবস্তুবদানে' মালিনীর দুইজন্মের ইতিহাস লিপি-বদ্ধ আছে। কাশীনগরীর জনৈক গ্রামাধ্যক্ষ কন্যা আজীবন এক 'প্রত্যেক বুদ্ধের'৩ সেবায় নিযুক্ত ছিল। 'প্রত্যেকবুদ্ধের' নির্বাণলাভের পর, তাঁর দেহাবশেষের উপর নির্মিত স্তূপটি অসংখ্য পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করে সেই কন্যা নানা উপচারে প্রতিদিন পূজা করত। স্তূপটি যেমন মাল্যশোভিত, জন্মান্তরে সেও যেন ঐরূপ মাল্যশোভিতা রূপে আবির্ভূত হয়—এই ছিল কন্যার মনোবাসনা। মৃত্যুর পরে সুকৃতির ফলে দেব-কন্যারূপে সে স্বর্গলোকে উপনীত হল এবং পরিশেষে মর্ত্যলোকে অবতরণ করে বারাণসীরাজ কৃকির কন্যা রূপে নবজন্ম লাভ করল। পূর্ব প্রার্থনা অনুযায়ী রত্নমাল্যে সুশোভিতা বলেই তার নাম হল মালিনী।৪ রাজা কৃকি সনাতন বৈদিক-ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। স্বভাবতই কন্যাকে তিনি ব্রাহ্মণ-সেবায় আদেশ দিলেন। কিন্তু উদ্ধত, চপল, অবিনীত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণ-দের প্রত্যক্ষ করে মালিনীর মনে জাগল বিতৃষ্ণা। সম্ভবত তার পূর্বজন্মের বুদ্ধভক্তির সংস্কারও এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। তবে হরিদেব শাস্ত্রী বলেছেন, মালিনী গোপনে গোপনে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ঐ শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে, আচারসর্বস্ব ও নানাভাবে বিকৃতিসম্পন্ন তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি মালিনীর অনীহা থাকাই স্বাভাবিক। মালিনী বিংশতিসহস্র শিষ্যাদিসহ বৌদ্ধগুরু কাশ্যপকে রাজান্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করল। স্বভাবতই রাজোর ব্রাহ্মণসমাজ এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হলেন। কারণ কৃকির আদেশ অনুযায়ী শুধু ব্রাহ্মণরাই মালিনীর সেবালাভের অধিকারী। বারাণসী নগরে তখন ব্রাহ্মণরাই সংখ্যাগুরু। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ সমবেতভাবে দাবি জানালেন মালিনীকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। প্রজারাও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক। প্রবল বিদ্রোহের আশঙ্কায় নিরুপায় রাজা অবশেষে ব্রাহ্মণদের দাবিই মেনে নিলেন। রাজে-দ্রলাল বলেছেন যে ব্রাহ্মণরা শুধু মালিনীর নির্বাসনই চেয়েছিলেন। কিন্তু 'মহাবস্তুবদানে' ব্রাহ্মণরা মালিনীকে হত্যা করার সংকল্পেই অবি-চলিত। মালিনীর নির্বাসনসংবাদ শুনে রাজান্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠল। পিতা কৃকি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কন্যাকে বিদায়সম্ভাষণ জানালেন। কিন্তু মালিনী সবিনয়ে সাতদিন সময় ভিক্ষা করে নিল। তারপরে ব্রাহ্মণরা তাকে যে দণ্ডই বিধান করুন, সে তা মেনে নিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মণরা মালিনীর এই প্রার্থনায় সম্মতিদান করলেন। হরিদেব শাস্ত্রীর মতে মালিনী স্বয়ং এবং প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী মালিনীর আমন্ত্রণে সমাগত কাশ্যপ এই সাতদিনের মধ্যেই রাজা,

রাণী, যুবরাজ, আত্মীয়বর্গ, অমাত্য, সৈন্যদল ও পুরবাসীদের অপূর্ব ক্ষমতাবলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, বিরোধী ব্রাহ্মণরাও বিদুষী মালিনীর আশ্চর্য বাগ্মিতায় অভিভূত হয়ে বৌদ্ধধর্মের মহিমা স্বীকার করেন। অর্থাৎ ধর্মবিরোধে মালিনীই সর্বাংশে জয়লাভ করে। কিন্তু 'মহাবস্তুবদানের' কাহিনীতে এত সহজেই বিরোধ মেটেনি। সপ্তম দিনে, পূর্বশর্ত অনুযায়ী যখন মালিনী 'দুঃখময় সংসার' ত্যাগে প্রস্তুত, তখন নবদীক্ষিত বৌদ্ধগণ মালিনীকে ব্রাহ্মণদের কবল থেকে রক্ষা করার সংকল্প করলেন। রাজেন্দ্রলালের ভাষায়ঃ "The converts regarded Malini as the saviour of their souls." মালিনীকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ সংগ্রাম যখন আসন্ন, তখন ভীত ব্রাহ্মণরা রাজার কাছে আশ্রয় নিয়ে ঘোষণা করলেন যে, মালিনী মুক্ত। কিন্তু 'সর্বদুর্দৈবের মূল' কাশ্যপের বিরুদ্ধে এবার তাঁরা প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। কাশ্যপকে হত্যার উদ্দেশ্যে 'ঋষিপত্তনে' তাঁরা বারবার সশস্ত্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য প্রত্যেকবারেই ব্যর্থ হল। কাশ্যপ সমস্ত সৈন্যকেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলেন। অবশেষে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণেরা দণ্ড ও লগুড় নিয়ে কাশ্যপকে আক্রমণ করলেন। তখন কাশ্যপের আহ্বানে পৃথিবী-দেবতা আর্বির্ভূত হয়ে একটি সুবৃহৎ তালীবৃক্ষ উন্মূলিত করে ব্রাহ্মণদের প্রত্যাঘাত করলেন। ব্রাহ্মণদের কেউবা পলায়ন করলেন, অধিকাংশের মৃত্যু হল।

'মহাবস্তুবদানের' গল্পাংশ এইটুকু। মালিনীর পরিণতি সম্বন্ধে এখানে আর কিছুই বলা হয় নি। শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য জানিয়েছেন যে, বারাণসী নগরের সমস্ত অধিবাসীকে বাগ্মিতাবলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়ে মনস্বিনী মালিনী আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে রাজী হল না। তখন কৃকি-র প্রস্তাব অনুযায়ী সারনাথে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে মালিনী বৌদ্ধরমণীদের শিক্ষাদানকর্মে আত্মনিয়োগ করল।

প্রথমেই দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাহিনীর সঙ্গে এই বৌদ্ধ আখ্যানের সাদৃশ্য কতটুকু! নাটকের ঘটনাস্থল কাশী আর্যধর্মের মহাদুর্গস্বরূপ। ক্ষেমংকরের ভাষায় "আর্যধর্ম মহাদুর্গ এ তীর্থনগরী পুণ্য কাশী"। রাজপরিবারও সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু "সৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্মেই" মালিনীর অনুরাগ। তারই আমন্ত্রণে অন্তঃপুরে 'বিধর্মী' সন্ন্যাসী'গণের আবির্ভাব হয়। রাজমহিষী ভীত হন। লোকে বলেঃ "বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, জাদুবিদ্যা জানে,/ প্রেতসিদ্ধ তারা"। মালিনীর এই নবধর্মচর্চার প্রতি রাজ্যের ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী অধিবাসীগণ বিদ্বিষ্ট, কঠোর পরিহাসপ্রবণ। কিন্তু মালিনীর মনে কোনো শঙ্কা নেই। সে অনুভব করেঃ "...কন্যা আমি নহি আজ,/নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তর্যামী/অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি"। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'প্রত্যেকবুদ্ধের' সেবিকা ও দেবকন্যার রূপে মালিনীর পূর্বজন্মের কাহিনীকে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সুকৌশলে আভাসিত করেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে সমবেত ব্রাহ্মণদের মালিনীর নির্বাসনের দাবি সম্পূর্ণ তথ্যসম্মত। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সুপ্রিয় যে নিরর্থক আচারসর্বস্বতা, দাম্ভিকতা ও 'মূঢ়তার দুর্বিনয়ের' অভিযোগ করেছে, 'মহাবস্তুবদানেও' ব্রাহ্মণমণ্ডলী সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন মালিনীর একই অভিযোগ ছিল। 'মহাবস্তুবদানে' কৃকি বলেছেন বারাণসী নগরী ব্রাহ্মণাক্রান্তা। প্রজাগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণসমাজ বিদ্রোহী হলে রাজ্যধ্বংসের সম্ভাবনা। নাটকেও প্রথম দৃশ্যের শেষাংশে সেনাপতি সংবাদ এনেছেনঃ "...বিদ্রোহী হয়েছে প্রজাগণ/ব্রাহ্মণ-বচনে। তারা চায় নির্বাসন/রাজকুমারীর"। যুবরাজের মুখে শোনা যায়ঃ "সৈন্যগণ নগরপ্রহরী/হয়েছে বিদ্রোহী"। দ্বিতীয় দৃশ্যেই বশীভূত ব্রাহ্মণ্য-সমাবেশে মালিনীর বিজয় বৈজয়ন্তী। প্রচলিত কাহিনীর চেয়ে শাস্ত্রী-প্রদত্ত কাহিনীর সঙ্গেই এর মিল বেশি। সে-খানেও মালিনী তার অসামান্য বাগ্মিতাগুণে সরাসরি বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের নবধর্মে দীক্ষিত করেছিল।

কিন্তু 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। 'মহাবস্তুবদানে' মালিনীর সর্বপ্রধান পরিচয়, সে কাশ্যপশিষ্যা। কাশ্যপ সেখানে অন্যতম প্রধান ক্রিয়াশীল চরিত্র। এমনকি

সেখানে শেষ পর্যন্ত কাশ্যপই মালিনীকে অনেকাংশে আবৃত করে ফেলেছেন। সাতদিনের মধ্যেই তিনি রাজন্যবর্গ, সৈন্যদল ও নাগরিকদের অপূর্ব ক্ষমতায় নবধর্মে দীক্ষিত করেন। উপসংহারে অলৌকিক উপায়ে ব্রাহ্মণদের পরাজয় ও মৃত্যু এবং কাশ্যপেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। অথচ নাটকের প্রথম দৃশ্যেই কয়েকটি সংলাপের পরেই তীর্থের পথে কাশ্যপ চিরতরে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। এই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে মহাবস্ত্ববদানের 'মালিনীবস্তুর' যেখানে শেষ, রবীন্দ্রনাথের 'মালিনীর' সেখানেই শুরু। অবশ্য একথায় বিপক্ষে কেউ কেউ বলতে পারেন যে শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রদত্ত কাহিনীতেও কাশ্যপের উল্লেখ নেই। মনস্বিনী মালিনীই সেখানে বারাণসীবাসীর দীক্ষাদাত্রী। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, নাটকে মালিনীর সাতদিনের সময় ভিক্ষা যেমন নেই, তেমনি ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার প্রসঙ্গও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া কাশ্যপের অনুগ্রহ লাভ করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মালিনীকে ঠিক বৌদ্ধধর্মে একান্ত বিশ্বাসী মনস্বিনী বলা চলে না। 'জ্ঞানসূর্য-উদয়-উৎসবে' তার 'পুষ্পকারাগার' তখনও উন্মুক্ত হয়নি। তার 'অন্তর চঞ্চল যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল পদ্মদলে'।

আসলে 'মহাবস্ত্ববদানের' কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর মধ্যে রূপগত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও স্বরূপলক্ষণে পার্থক্য ঘটে গেছে। বৌদ্ধ কাহিনী একান্তভাবেই ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের ধর্মীয় সংঘাত, ও পরিশেষে বৌদ্ধধর্মের মহিমাকীর্তনের উদ্দেশ্যেই রচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' আদৌ ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের দ্বন্দ্বাত্মক নাটক নয়। ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব এর প্রথমাংশেই কিছুটা স্থান লাভ করেছে, তার বেশি নয়। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'মহাবস্ত্ববদানের' মালিনীর তিন জন্ম। প্রথম জন্মে সে 'প্রত্যেক বুদ্ধের' সেবিকা। সেই সুকৃতির ফলস্বরূপ দ্বিতীয় জন্মে সে দেবকন্যা, আর সেই একই সংস্কারকে স্বীকার করে তৃতীয় জন্মেও সে কাশ্যপশিষ্যা বৌদ্ধধর্মচর্যার নেত্রীস্বরূপিণী। অর্থাৎ জন্ম থেকে জন্মান্তরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও তার চরিত্রের ধাতুগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। গভীরতর বিচারে রবীন্দ্রনাথের মালিনীর মধ্যেও আত্মিক বিবর্তন আবিষ্কার করা যায়। আপন যথার্থ ধর্মের স্বরূপ অন্বেষণে ক্ষান্তিহীন রবীন্দ্রনাথের মালিনীর একই সত্তায় নব নব রূপ। প্রথমেই সে পেয়েছিল তার পিতৃপিতামহের হিন্দুধর্ম, কাশ্যপের দীক্ষায় এরপর সে লাভ করল বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু এর কোনোটিকেই সে "নিজের মধ্যেই উদ্ভূত করে তোলে নি"। অবশেষে সমস্ত আরোপিত শাস্ত্রীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুপ্রিয়ের ভালোবাসায় যখন সে মানবধর্মে সমুন্নতি লাভ করল, তার আগেই 'মহাবস্ত্ববদানের' বৌদ্ধ কাহিনীর সমস্ত সাদৃশ্যসূত্র ছিন্ন করে সে হয়ে উঠেছে কবিপ্রজাপতির সম্পূর্ণ নতুন একটি অভিনব সৃষ্টি।৫ একথা সত্য যে সুপ্রিয় চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু মনে হয় রাজেন্দ্রলালের অনুবাদেই এর ভাববীজটি কবি খুঁজে পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের ভাষায়, নবদীক্ষিতগণের কাছে মালিনী 'আত্মার ত্রাণকর্ত্রী' ('Saviour of soul') রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েই মালিনী তাদের 'ত্রাণ' করেছিল। সম্পূর্ণ নতুন ব্যঞ্জনায় কথাটি মালিনী-সুপ্রিয় সম্বন্ধেও সত্য। মালিনীর করুণাঘন অন্তরের সুধাস্বাদনেই সমস্ত 'পৌরাণিক ধর্মজটিলতা' ভেদ করে সুপ্রিয়ের অন্তরে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানবধর্মের পরম সত্য। এই গভীরতর অর্থেই সুপ্রিয়ের কাছে মালিনীঃ 'Saviour of soul'।

৩

অথচ সংকোচের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাট্য-সমালোচকগণ 'মালিনী'র অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে যথেষ্ট অভিনিবেশের পরিচয় দিতে পারেন নি। অধিকাংশ সমালোচক 'মালিনী'কে নিতান্তই হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মের একটি দ্বন্দ্বাত্মক নাটক রূপে বিচার করেছেন। স্বভাবতই তাঁদের স্বকল্পিত 'ধর্মীয় বিরোধের' সঙ্গে তাঁরা নাটকের অন্তিমদৃশ্যের সংগতিবিধান করতে পারেন নি বলেই শেষপর্যন্ত বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব 'মালিনী'র কেন্দ্রীয় বিষয় নয়।

নাটকের সূত্রপাতেই তীর্থযাত্রী কাশ্যপ শিষ্যা মালিনীকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

> ত্যাগ করো, বৎসে, ত্যাগ করো সুখ-আশা,
> দুঃখভয়; দূর করো বিষয়পিপাসা;
> ছিন্ন করো সংসারবন্ধন; পরিহরো
> প্রমোদপ্রলাপ চঞ্চলতা; চিত্তে ধরো
> ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
> রাত্রিদিন — মোহশোক পরাভূত হোক্।

ছয়টি পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত এই একটিমাত্র বাক্য আসলে একটি 'ধ্রুবশান্ত' সংকল্পেরই প্রতীক।৬ এখানে কাশ্যপ 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' নির্বাণবাদী সন্ন্যাসীরই দোসর। কাশ্যপের এই জীবনবিরোধী বৈরাগ্যধর্মের ঠিক বিপরীত কোটিতে উপনীত হয়েই নাটকের অন্তিম পর্যায়ে মালিনী তার আপন ধর্মকে খুঁখে পেয়েছে। কাজেই মালিনীর 'কাশ্যপশিষ্যা' পরিচয়টুকুই চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়ে যাঁরা মালিনীর চরিত্রে অসংগতির অভিযোগ এনেছেন তাঁদের যুক্তি গ্রাহ্য হবে না। আর তলিয়ে দেখলে মালিনী চরিত্রের মানসবিবর্তনের একটি সূক্ষ্ম স্তরপরম্পরা আবিষ্কার করা কঠিন নয়। তবে সংহত নাট্যপরিসরে বিবর্তনের স্তরগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট ও পৃথগ্‌ভূত নয়। বরং ইঙ্গিত-প্রতীক-উল্লেখনের মধ্য দিয়ে অভিব্যঞ্জিত।

নাটকের প্রথম তিনটি দৃশ্যের প্রেক্ষাপটের দিকেই সর্বপ্রথম তাকানো যাক। একই দিনের অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ণ অতিক্রম করে রাত্রির তমিস্রা এই তিনটি দৃশ্যে ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ঐ অন্ধকার শুধু নিসর্গলোকেই সত্য নয়, মালিনীর মনোলোকেও সঞ্চারিত। আসলে এই 'অন্ধকার' মালিনীর ধর্ম-বোধের একটি গভীর সংকটেরই প্রতীক। কাজেই প্রথম তিনটি দৃশ্য একত্রে স্বরূপত মালিনীর জীবনের একটি বিশেষ ভাবাবস্থাকেই ব্যঞ্জিত করে। পরবর্তীকালে এই সত্য বুঝতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ 'মালিনীর' ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে ঐ তিনটি দৃশ্যকে সংযোজিত করে একটিমাত্র দৃশ্যে সংহত করেন।৭ প্রথম দৃশ্যে কাশ্যপকে সম্বোধন করে মালিনী আপন চিত্তলোকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে বলছেঃ

> ভগবন, রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে;
> সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে
> আবদ্ধ ভ্রমরী — স্বর্ণরেণুরাশি মাঝে
> মৃত জড়প্রায়।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে 'হৃৎপদ্মের জাগরণই ধর্মচেতনার নামান্তর।৮ কিন্তু মালিনীর হৃদয় 'সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরক'। একদিকে সে পিতৃ-পিতামহের কুল-ধর্ম পরিত্যাগ করে কাশ্যপের কাছে বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা-গ্রহণ করেছে; কিন্তু আপন আত্মার মধ্যেই উদ্ভূত হয়ে ওঠে নি বলে এই নবধর্মও তার কাছে স্পষ্ট নয়। সেই 'সংশয়তিমিরে' কাশ্যপের 'বিদ্যুন্ময়ী বাণী' মালিনীর চিত্তাকাশে শুধু 'ক্ষণিকের তরে ক্ষণপ্রভাবৎ' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মালিনী যাকে 'মহাক্ষণ' বলে ভুল করেছে তা শুধু ঐ ক্ষণিকের চকিত আলোকোদ্ভাস। কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় পদ্মদল উন্মীলিত হয় না, তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় সূর্যোদয়ের। 'বাইরে থেকে পাওয়া' নবধর্ম মালিনীর 'পুষ্পকারাগার' উন্মুক্ত করতে পারে নি। মোহাবিষ্ট অন্তরের সেই অস্থির চাঞ্চল্য মালিনীর স্বগতভাষণেই অনাবৃত হয়েছেঃ

> ...কভু বিদ্যুতের মতো
> চমকিছে আলো, বায়ুর তরঙ্গ যত
> শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
> কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
> বারম্বার। কিছু আমি নারি বুঝিবারে
> জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে!

চিত্তের এই লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তিকেই 'মহাক্ষণের' আবির্ভাব-সংকেত বলে ভুল করে মালিনী মানবিক স্নেহপ্রীতির মধুর বন্ধনকে সহজেই অস্বীকার করতে পেরেছে। স্নেহময়ী জননীকে বলেছেঃ

> আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দুঃখশোকে —
> শাখা হতে চ্যুত পত্র-সম। সর্বলোকে
> যাব আমি — রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
> বাহির-সংসার।

পিতার প্রচ্ছন্ন বাৎসল্যবেদনাকে উপেক্ষা করে মালিনী বলেছেঃ

বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো, ছেড়ে দে মা — কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা.....

কাশ্যপের 'মমত্ববোধবিরহিত চিত্তবিমুক্তির' ধর্মকেই মালিনী আপন ধর্ম বলে বিশ্বাস করেছে। এই বিশ্বাস সম্বল করেই মালিনী স্বেচ্ছায় নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে বহির্বিশ্বে বেরিয়ে এল। 'সমস্ত জগৎ হতে অতিশয় দূরে শতভিত্তি অন্তরালে রাজ অন্তঃপুরে' এতদিন মালিনীর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আজ অন্ধকার পেরিয়ে চন্দ্রালোকিত বিশ্বলোকে এই প্রথম 'অভিনিষ্ক্রমণ' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' অষ্টম দৃশ্য। সন্ন্যাসী বলছেঃ

এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বন্ধ গুহা!
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন
দীপ জ্বলে উঠিতেছে দু-একটি করে —
সন্ধ্যায় আরতি হয়, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে!
আহা একি সুমধুর! একি শান্তি সুধা!
কি আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে।
মনে সাধ যায় ওই তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।

এর সঙ্গে তুলনীয় মালিনীর উক্তিঃ

...দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।...
...ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির —
স্তব্ধছায়া তরুরাজি — দূরে নদীতীরে,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা — আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে!

দুটি অংশের এই সাদৃশ্য বিস্ময়কর। আসলে গুহা-নিষ্ক্রান্ত সন্ন্যাসীর মতো মালিনীও প্রথম এখানে উপলব্ধি করেছেঃ "শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক"।৯ তাই যে মালিনী বাৎসল্যের স্নেহবন্ধনকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে এসেছে তারই বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত আকাশ-পৃথিবী নিমেষের মধ্যে হয়ে উঠল 'মৈত্রীভাবনার' মূর্ত প্রতীকঃ

...কী শান্ত আকাশ
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে...

এখানে মহাকাশের বক্ষোলগ্ন পৃথিবীর অসামান্য রূপকল্পটির মধ্য দিয়ে 'মাতা যথা নিযং পুত্তং' পর্যায়ের 'মৈত্রীভাবনা'র রসরহস্য অনাবৃত হয়েছে। নিজের ধর্মমতের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বারবার সুত্তপিটকের এই শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন।১০ সম্পূর্ণ শ্লোকটি হলঃ

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং॥

'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই শ্লোকটির অনুবাদ করেছিলেনঃ "মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই-প্রকার অপরিমিতমানস রক্ষা করবে।" মৈত্রী ও করুণাঘন বিশ্বভুবনের এই আত্মিক সৌন্দর্যকে মানসপ্রত্যক্ষ করেছে বলেই মালিনীকে ব্রাহ্মণরা বলেছেনঃ 'বিগ্রহিণী দয়া'। কিন্তু কোন্ শক্তিতে মালিনী এই সৌন্দর্যকে লাভ করল? প্রেম। 'Beauty is lover's gift'। 'প্রকৃতির প্রতি-শোধের' সন্ন্যাসী নতুন বোধে সমুত্তীর্ণ হয়েই বলেছিলঃ "ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে/তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার"। সৌন্দর্যই মালিনীর অন্তরে প্রেমের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। "সৌন্দর্য ও প্রেম" শীর্ষক নিবন্ধে তরুণ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ"সৌন্দর্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে।"১১ প্রেমের মধ্যে এই পরম পূর্ণতাকে উপলব্ধি করেই মালিনী বলেছেঃ

...আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয় —
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে।

এই 'অমৃত' স্বরূপলক্ষণে প্রেমেরই অমৃত। কাশ্যপ-শিষ্যার গোত্রান্তর এখানেই সর্বপ্রথম আভাসিত। গৃহের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে মালিনী বহির্বিশ্বে মুক্তি চেয়েছিল। তৃতীয় দৃশ্যে তার অনিবার্য প্রত্যাবর্তন। শাস্ত্রীপ্রদত্ত কাহিনীতে গৃহপ্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক মালিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মালিনীর আচরণের এই সম্পূর্ণ বৈপরীত্য-টুকু ইঙ্গিতপূর্ণ। যে ধর্ম তার স্বধর্ম নয় তাকেই ক্ষণিক উন্মাদনাবশে গ্রহণ করে সে শ্রান্ত, অকারণ বেদনায় ভারাক্রান্ত। ঐ শ্রান্তি, ঐ বেদনা উপেক্ষিত হৃদয়ধর্মেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। যে 'বিশ্বদেবী' 'লোকলক্ষ্মী মাতা' রূপে বহুজনের হৃদয়ে অবিচলিত প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করেছিল, সে নিমেষের মধ্যে নেমে এল ফেলে-যাওয়া মাতৃক্রোড়েঃ

> মা গো শ্রান্ত এবে আমি। কাঁপিতেছে দেহ।
> কোথা গিয়েছিনু চলে ছাড়ি মার স্নেহ
> প্রকাণ্ড পৃথিবী মাঝে।...

তৃতীয় দৃশ্যের উপসংহারে নিদ্রাভিভূতা মালিনীকে কোলে নিয়ে স্নেহময়ী জননীর করুণাকাতর কণ্ঠে যে অপূর্ব কল্যাণমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে—তারই মধ্যে প্রাণের ধর্ম, প্রেমের ধর্মের অন্তিম জয় আভাসিত হয়েছে।১২

৪

'মালিনী'র রচনাবলী-সংস্করণের 'সূচনা' অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে।... সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।" 'যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা' তারই দৃষ্টান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে মালিনীর চরিত্রে। সেই করুণাময়ীর অন্তর থেকে পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব সুপ্রিয়ের চিত্তে প্রতিফলিত হল। শাস্ত্রীয় ধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ক্ষেমংকরকে সুপ্রিয় বলেছেঃ

> ...মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
> মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমংকর! ভ্রমিলাম
> বৃথা এ সংসারে এতকাল। পাই নাই
> কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
> কেঁদেছে সংশয়ে।...
> ...এতদিন পরে
> এ মর্তধরণীমাঝে মানবের ঘরে
> পেয়েছি দেবতা মোর।

এই মানবধর্মেরই শেষ পরিণতি প্রেমের ধর্মেঃ

> ...আজ আমি লভিয়াছি
> ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।
> সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
> আমার দেবতা নহে।

'সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা আমার দেবতা নহে' —এ যেন সুপ্রিয়ের কণ্ঠে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বাণী উচ্চারিত। আসলে রবীন্দ্রনাথই সুপ্রিয়। মনে রাখতে হবে 'মালিনী' 'চিত্রা' কাব্যের অব্যবহিত পরবর্তী রচনা। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'চিত্রা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'মালিনী' রচিত হয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে। অর্থাৎ চূড়ান্ত স্তরে অধিরোহণ করে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা তখন অন্তর্যামী জীবনদেবতা-চেতনায় পরম পরিণতি লাভ করেছে। সুপ্রিয় চরিত্রের ভাবরূপ রবীন্দ্রনাথের ঐ অন্তরঙ্গ প্রেমচেতনায় অধিবাসিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। মালিনীকে লক্ষ্য করে সুপ্রিয় বলেছেঃ

> লভিলাম যেন আমি নবজন্মভূমি
> যেদিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি

বলা বাহুল্য, এই 'সুধা নারীর হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করা অমৃত।

এই প্রসঙ্গে সমগ্র নাটকে পুনরাবৃত্ত একটি রূপকাত্মক রূপকল্পের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তরণী-রূপকল্প। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, এই 'তরীর উপমা' 'বেগের প্রতীক' ছাড়া আর কোনো

সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিচয় বহন করে না।১৩ কিন্তু সম্যক্ বিশ্লেষণে সমালোচকের এই মন্তব্য গৃহীত হবে বলে মনে হয় না। নাটকের প্রথম দৃশ্যে মালিনীর উক্তিতেই ঐ তরণীপ্রতীকটি সর্বপ্রথম আভাসিতঃ

...নৌকাখানি তীরে বাঁধা — কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই — গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান—মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে।

'নৌকা' এখানে বৌদ্ধধর্ম, 'গৃহহীন যাত্রী' ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাসা ভেঙে বেরিয়ে আসা 'ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন' মানুষের দল। মালিনী সেই নৌকার কর্ণধার। 'তীরের সন্ধান' তার জানা। তৃতীয় অঙ্কে বিমুগ্ধ বিদ্রোহীগণ বলেছে, মালিনীর দিব্যপ্রেরণাবলেই তাদের 'পরাণতরী' 'পথ পাবে পারাবারে' 'ধ্রুবতারা ধরি যাবে মুক্তিপারে'। আশ্চর্যের বিষয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত শাস্ত্রী-প্রদত্ত মালিনীর জীবনভাষ্যে এই অর্থেই তরণী-রূপকল্পটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মালিনীকে সংসার ত্যাগের সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্য ধর্মান্তরিত পিতা কৃকি বলেছেনঃ "তুমি এ অবস্থায় আমাদিগকে ত্যাগ করিলে আমরা স্রোতস্বতী নদীতে কর্ণধারহীন নৌকারোহিগণের ন্যায় বিষম সংকটে পড়িব।"

কিন্তু এই ধর্মতরণীর রূপকল্প সুপ্রিয়ের নিজস্ব অন্তরঙ্গ উপলব্ধির জারকরসে অভিষিক্ত হয়ে নবব্যঞ্জনা লাভ করল। ধর্মতরণী হ'ল 'প্রাণের পালে প্রেমের হাওয়া লাগানো' 'জীবন-তরণী'।১৪ সুপ্রিয় বলছেঃ

...আজি তুমি কে আমার
জীবনতরণী 'পরে রাখিলে চরণ —
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ —
একি গতি দিলে তারে!

এই বিবর্তনটুকু স্মরণে রাখলে চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর উক্তিকে আর আকস্মিক বলে মনে হবে নাঃ

...বিশ্বে বাহিরিয়া
আজি মোর জাগে ভয়—কেঁপে ওঠে হিয়া,
কী করিব কী বলিব বুঝিতে না পারি —
মহাধর্মতরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি...

এই একাকীত্ববোধ আসলে 'যথার্থ দোসরের'১৫ জন্য অভাববোধেরই সূচক। সুপ্রিয়কে মালিনী বলেছেঃ

...অকস্মাৎ
আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত
সহস্র লোকের মাঝে! সেই দুঃসময়ে
তুমি মোর বন্ধু হবে? মন্ত্রগুরু হয়ে
দিবে নবপ্রাণ?

সুপ্রিয়ের প্রেমের মন্ত্রেই মালিনী সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠল। 'বাইরে থেকে পাওয়া' নবধর্মের 'ক্ষণপ্রভা' জীবনের পথকে আলোকিত করতে পারে না। প্রেমই 'পথের আলো'।১৬ মালিনীর উদ্দেশ্যে সুপ্রিয় বলেছেঃ

পথ আছে শতলক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী — তাই আমি চাই
একটি আলোকরেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

বিদ্যুৎ ছিল বহিরাকাশে। তার আলো মালিনীর নিজস্ব উপলব্ধিসঞ্জাত নয়। কিন্তু প্রেমের আলোকেই শেষপর্যন্ত মালিনীর চিত্তাকাশে অপরূপ ঊষাসমাগমঃ

কপোল ঊষার
যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হ'তে দেরী নাই আর।

সুপ্রিয় মালিনীর ঐ 'ঊষারুণ করুণ বয়ানেই' তার ধর্মকে মানসপ্রত্যক্ষ করেছে। এতদিন তার কাছে শাস্ত্র ছিল 'অন্ধ জীবনবিহীন'। মালিনীর 'দুটি নেত্রে জ্বলে-ওঠা 'উজ্জ্বল শিখা'র আলোকেই সুপ্রিয়ের কাছে 'বিশ্বশাস্ত্রে'র মর্মসত্য উদ্ঘাটিত হয়েছেঃ

ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা —
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।১৭

এমনকি ক্ষেমংকরের দৃষ্টিতেও মালিনীর মুখখানি

'অন্তর্জ্যোতির্ময়' রূপেই উদ্ভাসিত হয়েছে। এই সূর্যোদয়ের সংকেতগূঢ় রূপকল্পগুলি প্রথম অঙ্কের সূর্য-পদ্ম রূপকল্পের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি অন্তরঙ্গ ভাব-ঐক্য সৃষ্টি করেছে। প্রথম তিনটি দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে ছিল রাত্রির অন্ধকার। চতুর্থ দৃশ্যে স্পষ্টভাবে কাল-নির্দেশ না থাকলেও ঘটনাধারা থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে তখন দিবাভাগ। কাশ্যপ বলেছিলেন 'জ্ঞানসূর্য উদয়-উৎসবেই' মালিনীর হৃৎপদ্ম উন্মীলিত হবে। সুপ্রিয়ের প্রেমের আলোকেই বিশ্বপ্রেমের ধর্ম মালিনীর অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেঃ

সর্বজীবে দয়া জানে সবে —
অতি পুরাতন কথা — তবু এই ভবে
এই কথা বসি আছে লক্ষবর্ষ ধরি
সংসারের পরতীরে। তারে পার করি
তুমি আজি আনিয়াছ সোনার তরীতে
সবার ঘরের দ্বারে।

'আরোপিত জ্ঞান' এইভাবে 'উপলব্ধ জ্ঞানে' রূপান্তরিত হয়ে 'হৃৎপদ্মের জাগরণ'কে অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে। কাশ্যপের 'মহাক্ষণ' অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনায় হয়ে খঠেছে মানবধর্মের শুভজাগরণলগ্ন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "To gain religion within is man's great lifelong adventure. In the extremity of suffering must it be born ; on his life-blood it must live." এই সত্যেরই প্রতীক সুপ্রিয়ের জীবন। প্রবাস থেকে ক্ষেমংকর যখন পত্র লিখে জানালো যে 'শোণিতের স্রোতে' নবধর্মকে ভাসিয়ে দিয়ে মালিনীর প্রাণদণ্ডবিধান করার উদ্দেশ্যে সে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সুপ্রিয়ের অন্তরতম সত্য-ধর্মের কাছে বন্ধুপ্রীতি হল পরাজিত। রাজসকাশে ক্ষেমংকরের ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রকাশিত হল। ফলে ক্ষেমংকর হল বন্দী। উল্লসিত রাজা যখন সুপ্রিয়কে কন্যাপদে পুরস্কৃত করতে চাইলন, তখন কিন্তু সুপ্রিয় বলেছেঃ 'বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বর্গলোক চাহি না লভিতে'। অর্থাৎ, আত্মসুখের জন্য নয়, মহত্তর ধর্ম-রক্ষার জন্যই এই বিশ্বাসভঙ্গ। ক্ষেমংকরের প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রিয় বলেছেঃ

বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস
প্রাণসখে, ধর্ম সে আমার।

যে-ধর্মকে সে আপন অন্তরে সত্য বলে অনুভব করল, সেই ধর্মের জন্যই তাকে 'হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহার' দিতে হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে শেষবারের মতো মালিনীর জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে তার মানবধর্মই জয়লাভ করেছে। সুপ্রিয়কে ভালোবেসেই মালিনী এই মানবধর্মকে লাভ করেছিল। কিন্তু একদিন যে সে তার আপন প্রকৃতির দাবি অস্বীকার করেছিল তারই মর্মান্তিক প্রায়শ্চিত্ত করতে হল প্রিয়তমের বিসর্জিত বক্ষোরক্তে। নাটকের অন্তিমে 'মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে'—মালিনীর কণ্ঠোচ্চারিত এই অন্তিম ক্ষমার মধ্যেও তার মানবধর্ম, প্রেমের ধর্মই বিজয়ী। লক্ষ্য করতে হবে, এই ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করেই মালিনী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে; সুপ্রিয়কে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে অনিঃশেষ অশ্রুক্ষরা বেদনার মধ্য দিয়েই 'সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত' সহৃদয়মানসে পরম-আস্বাদ্যমান হয়ে উঠেছে।

'মালিনী' রবীন্দ্ররসিকসমাজে আজও তার যথার্থ মূল্য পায় নি। অথচ রবীন্দ্রমানসে 'পারিবারিক ধর্ম-সাধনার' প্রভাবকে অতিক্রম করে আপন ধর্মকে খুঁজে পাওয়ার নিগূঢ় আত্মিক ইতিহাসই রূপায়িত হয়েছে 'মালিনী' নাটকে।

উল্লেখপঞ্জী

১। 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত'/পত্রপুট২৫

২। শ্রীমতী পম্পা মজুমদারের গবেষণাগ্রন্থ 'রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎসে' তালিকাটি মুদ্রিত হয়েছে।

৩। "The concept of the Pratyeka-Buddhas is found to have developed to a great extent during the period represented by the Mahā-vastu-avadāna. These are self-controlled and self-possessed ascetics who attain enlightenment without proclaiming it to the

world. In Buddhist dogmatics the Pratyeka-Buddhas attain enlightenment for themselves and by themselves without the aid of any teacher and they do not even propose to act as teachers to others."

—'মহাবস্তু-অবদান' [প্রথম খণ্ড] ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের ভূমিকা।

৪। "She was named 'Malini'—literally one crowned with a chaplet of jewels."

—তদেব।

৫। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনীর' পৌরাণিক কাহিনীর খুঁটি-নাটিকে আদৌ গুরুত্ব দেন নি। ১৩০৫ সালে লেখা একটি চিঠিতে বলছেনঃ

"কৃকি বৌদ্ধ পুরাণের একটি কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র—সেই পুরাণে তাহার যে সময় নির্ণয় করে ইতিহাসে তাহা কুলায় না—শাক্যবুদ্ধের পূর্ববর্তী কোনো এক গৌতমবুদ্ধের সময় ঐ গল্পের ঘটনা কাল, কিন্তু সে সময় যখন কোনো কালে ছিল না তখন সে ঘটনাও কোনো কালে ঘটে নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।" —প্রভাতকুমার-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলী/'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫।

৬। তুলনীয় 'নৈবেদ্য' কাব্যের ৭২ সংখ্যক কবিতা। সমগ্র কবিতাটিই একটিমাত্র বাক্যে গ্রথিত হয়ে একটিমাত্র মহৎ সংকল্পকে প্রকাশ করছে।

৭। দ্রষ্টব্যঃ *Collected Poems and Plays of Tagore.*

৮। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষ 'ত্রিজ'। ব্যক্তিসীমা থেকে বিশ্বসীমায় আপন চৈতন্যকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করে 'ত্রিজত্ব' লাভই তার ধর্ম। পদ্মের উন্মীলনলীলার সঙ্গেই তা তুলনীয়।

৯। 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' ভূমিকা/রচনাবলী সংস্করণ।

১০। শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার করেন 'ধর্ম' গ্রন্থের 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে। এছাড়া *Sadhana* (১৯২০), *Religion of Man* (১৯৩১), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থে শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে বা অংশত উদ্ধার করেছেন। এছাড়াও আছে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্রাবলীতে।

১১। 'আলোচনা' গ্রন্থ/সৌন্দর্য্য ও প্রেম/সুন্দর সুন্দর করে।

১২। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার কিছু কিছু রূপকল্পের সঙ্গে নাটকের এই অংশের আশ্চর্য সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। সাম্প্রতিককালে জনৈক গবেষক 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার প্রেরণামূলে বৌদ্ধ মেত্তীভাবনার অস্তিত্বকে প্রমাণিত করেছেন।

১৩। দ্রঃ রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা (প্রথম খণ্ড)।

১৪। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে জীবনদেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 'যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপর প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া চলিয়াছেন' তিনিই কবির জীবনদেবতা।

১৫। 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধ/ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।

১৬। 'মানুষ পথিক, প্রেম তার পথের আলো'—বিচিত্র প্রবন্ধঃ 'পথপ্রান্তে'। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই নাটকে সুপ্রিয়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে।

১৭। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য আত্মকথা রচনা করতে গিয়ে আপন ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রিয়ের এই সংলাপটিকেই উদ্ধার করেছেন। সুপ্রিয়-মানস যে রবীন্দ্র-মানসেরই সহোদর, এ তারই আর একটি প্রমাণ।

টাইপরাইটারে প্রেমপত্র বনাম কমল মাহাতোর গান

তথাগত চক্রবর্তী

॥ প্রাক্-কথন ॥

গোলাপী নখের ডগায় অর্গানের নরম সুরের ইন্টিমেট সন্ধ্যায় যদি ধূলিধূসরিত পায়ে কোন এক সাবলীল লোকসঙ্গীত গায়ক ব্যানা (সারিন্দা জাতীয়)-য় সুর তুলে উচ্চগান্ধারে 'ও বন্ধুরে.....' বলে গান ধরে, তার অনিবার্য ফলাফল যা-যা হতে পারে তা কয়েক রকম। প্রথমত, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রথমে নাসিকাকুঞ্চন এবং পরে ঠোঁটের বাঁদিকে ঝোলা হাসি; দ্বিতীয়ত, কিছু লোকের অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা; তৃতীয়ত, অল্প কয়েকটা ইংরেজি ইস্কুলে পড়া কিংবা না-পড়া ছেলে-মেয়েদের নিগ্রো স্পিরিচুয়াল বা বড়োজোর 'রানার' কিংবা পল রোবসনের গান সম্পর্কে ভাসাভাসা ক্রস রেফারেন্স-টানা প্রগতিশীল দৃষ্টিতে কথাবার্তা বলা; চতুর্থত, কিছু ছা-পোষা মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক, অজ্ঞত, সৎ অথচ সাময়িক আগ্রহী মনন-শীলতা। আর তারই মধ্যে কোন কোন বুদ্ধিজীবী যিনি সত্যিই শৈশবকে ফেলে এসেছেন তিস্তা-তোর্ষা-আত্রেয়ী-পদ্মার পারে তাঁদের এটিকেট ভঙ্গ না-করা উদাসীনতা।

লোকসংগীত তথা লোকসংস্কৃতির ঠিক এমনি এক উদাসী তারিফ কিংবা উন্নাসিকতার বেড়া ডিঙিয়ে যদি গোটা ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করি তাহলে মূল গণ্ডগোল-কে হয়তো বুঝতে পারব।

॥ দম ব্রাজো/তুঙ্ রিম্ মং ওয়া[১] ॥

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মানুষের জীবনে গান এসেছে নাচের পরে। বলা ভালো, নাচ-গান-ভাষার জন্ম মূলত প্রয়োজনের তাগিদে। নান্দনিক তাগিদের প্রশ্ন এসেছে অনেক পরে। বুশের প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানীদের মতবাদ অনুসারেঃ হাতিয়ার ব্যবহারের সময় পেশীগুলিতে জোর পড়ে, তারই প্রতি-বর্তী ক্রিয়া হিসাবে স্বরযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াটি থেকেই মানুষের গলায় ভাষা ফুটে উঠেছিল। তারপর হাতের কাজের যতো উন্নতি হয়েছে, ততোই উন্নত হয়েছে স্বরযন্ত্র এবং এই ক্রিয়াটিই সচেতনভাবে ভাবের আদানপ্রদানের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। আর এইভাবেই আদিম সভ্যতার কম্যুনিকেশনের জন্যে বিচিত্র এবং জটিল অঙ্গভঙ্গীর ব্যবহার কমে ক্রমশ একটি সহজতর ভাষাভঙ্গিমার উদ্ভব। এবং যেহেতু সেই সময়ের যে কোন কাজই শ্রমসাধ্য ছিল, এবং ছিল সমবেত প্রচেষ্টার ফল, অতএব যে কোন কাজই শুরু করবার আগে সে-সম্পর্কে সমবেত চিন্তা প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই শিকার করতে যাবার আগে তারা ভালুক-নাচ নাচত বা ফসল ফলাতে যাবার আগে তারা বৃষ্টির জন্যে চিন্তা করত। এই সমবেত চিন্তা থেকেই তারা সাহস সঞ্চয় করতে চাইল। সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে এল গোটা ব্যাপারটার একটা মহড়া। এই মহড়া থেকে জন্ম নিল যাদুবিশ্বাস যা পরবর্তী আদিম জীবনে হয়ে দাঁড়াল সংস্কার। গোষ্ঠীসংস্কার বা 'টোটেম' এল সেই মানব জীবনে। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকমঃ সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে যে ছবিটা দেখতে চেয়েছিল সেই মানুষ শুধু কল্পনায়, যাদুবিশ্বাসের হাত ধরে সে পৌঁছল সংস্কারে। আর সেই সংস্কারের আর্ট ফর্ম-কে আমরা দেখলাম নাচ বা

১। লেপচা ফসল তোলবার গান।

গান হিসেবে। আরও লক্ষ্য করা গেল, যে কাজের তাগিদে নাচ-গান-ভাষার জন্ম, সমাজের বিবর্তনে সেই নাচের থেকে গান হোল আলাদা আর সেই গান থেকে সুর আলাদা হয়ে জন্ম দিল কবিতার। এইভাবেই, কাজের তাল থেকে ছন্দ এল, নাচ এল, গান এল; এমন কি কবিতাও এল।

বেঁচে থাকার এমনি এক তাগিদেই আর্টের জন্ম। প্রয়োজনবাহিত হয়েই জীবনধারার সঙ্গে একীভূত হয়ে বহমান হয়েছে এই সংস্কার। পাথরের চাঁই কেটে অতি-প্রাকৃত দেবতার জন্ম দিয়েছি এই সংস্কারক আমরা। এবং একালীন দেবীমুখকে হেমামালিনী করে গড়ে তোলবার পিছনে চিন্তানৈপুণ্য আমাদেরই। অর্থাৎ আর্টফর্ম যা হোল কিনা আমাদের চিন্তার প্রয়োগনৈপুণ্য, তার নিয়মিত পরিবর্তন ঘটেছে অবস্থাবদলের সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের বুদ্ধি বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে সূক্ষ্মতা। নন্দনতত্ত্ব আর অস্তিত্ববাদের প্যাঁচ কষাকষিতে ধ্রুপদী আর লোকায়ত একটা দোতলা সংস্কৃতি তৈরী হয়েছে। আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নাসিকতার এ্যাসিডে লোকসংস্কৃতির এই তরল অস্তিত্বটি একেবারে ছানা কেটেছে। আর সাংস্কৃতিক সেই অজীর্ণ অসুখে শিক্ষিত সমাজ ক্ল্যাসিসজম নামক একমাত্র মহৌষধ যা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখে, তা পান করেছেন। শিক্ষিত সমাজের দাপটে লোকায়ত দর্শন এবং শিল্প হয়ে পড়েছে অন্ত্যজ। সেই সংগে শিক্ষিত সমাজের ধর্ম যেহেতু নিষ্পেষণ এবং স্বচিন্তার সর্বশক্তি নিয়োজিত প্রযুক্তি, অতএব শিক্ষিত সমাজের ছাপহীন মূদু-উচ্চারিত এই শিল্পমাধ্যমটি যে কবে সামাজিক করুণার পাত্র হয়ে পড়েছে, নৃতত্ত্ববিদের পাঁজিতে তা লেখা হয় নি। তবু আশ্চর্যের কথা। লোকসংস্কৃতি কিন্তু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থেকেছে। অস্বীকার করে লাভ নেই, এই টিঁকে থাকাটা সামগ্রিকভাবে টিঁকে থাকা, ব্যক্তিগতভাবে বেঁচে থাকা নয়, এবং শহরের জন্ম যেহেতু অনেক পরে, লোকসংস্কৃতির সাদামাটা গপ্পোটা বেঁচেই থেকেছে। অস্তিত্বের এই অলিখিত প্রতিযোগিতায় শিল্পমাধ্যমগুলির মধ্যে যারা আবার রাজপ্রসাদপুষ্ট হয়েছে, সেইগুলোই বেঁচে গেছে। আর যারা পরেনি তারা সমাজের নিম্নস্তরের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে। মোদ্দা কথা, বিক্রমাদিত্যের সভায় যারা আসে, তারাই পুষ্ট হয়। আর যারা রাজপ্রসাদ পায়নি শিল্পনৈপুণ্যের অক্ষমতায়, তারা রাজপ্রাসাদের বাইরে মূদু অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থেকেছে। আমাদের ইতিহাস এদের নিয়ে নয়। তাই দায়টা পড়েছে নৃতত্ত্ববিদের 'পরে। শিক্ষিত সমাজের উন্নাসিকতা এবং উদাসীনতার এই হোল আদিপর্ব।

লোকসংস্কৃতি এমনি এক অবস্থাতেই বর্ণসমাজে (caste-society) অন্ত্যজ হয়ে টিঁকে থেকেছে। এবং যেহেতু বর্ণসমাজ মূলত সমবায়-ভিত্তিক, শোষণপুষ্ট শিক্ষিত সমাজে সেই horizontal কাঠামো, vertical কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়েছে। আর তারই সঙ্গে অধ্যাত্মবাদ (শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক বিকশিত) এবং যাদুবিশ্বাস (লোকসমাজ কর্তৃক বন্দিত) এই দুই ধারণা প্রাকৃতিক রহস্যবিচারের অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা ব্যাপারটা একটা আধপোড়া খিচুড়িতে উপস্থাপিত করেছে জনসাধারণের কাছে। বেঁচে থাকবার সঠিক সংস্কার যা পাল্টাবার কথা ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বিশাল স্থাণু কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় তা স্বভাবত পাল্টায় নি। লোকসংস্কৃতির বড়ো কোন পরিবর্তন আসে নি। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের তথা বাংলার সেই খেয়োখেয়ির যুগে সাহেব শাসন বা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ধাক্কা না মারলে কী হতো বলা যায় না, তবু সাহেব শাসন আসায় চেহারাটা প্রথম পাল্টাতে শুরু করল। ভাবলে বেশ মজার! শহরগুলো—বিশেষত কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ তখন বেশ পশ্চিমী বা westernized হতে শুরু করেছে। অথচ তখন এদেশে কোন কলকারখানা বসে নি—industrialization শুরু হয় নি। পশ্চিমী শহুরে সভ্যতা যে প্রাচ্যশহরে ঘাঁটি গেড়ে বসতে শুরু করল, তার ফলাফল হলো এই যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শন ঘটল মূলত পশ্চিমের জানলাটা খোলায়।,গাঁয়ে-গঞ্জের লোকের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা থেকে গেল বিস্ময়ের—ভয়ের নয়। গাঁয়ের মানুষ কলকাতা শহরের ইলেকট্রিরির আলো আর আসল 'ইভ্‌নিঙ ইন প্যারিসের' প্রতি একই রকম আচরণ

করল। গাঁয়ের মানুষের সেই অবাক-হওয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি কিন্তু ঢুকে পড়তে লাগল তার বিলাসবিমুগ্ধ জীবনে। হাইল্যা-পানঠা মানুষ দেহে মনে আতর জলে চান করবার কথা ভাবল। যে শোষণটা চলবার, সেটা চলল। যে উন্নাসিকতা এতটাকাল বাহিত হয়ে আসছিল তার দ্বিতীয় পর্বের উন্মেষ ঘটল এই এখনই।

উন্নাসিকতার তৃতীয় পর্বে আসছি আমি। এবং আপনি।

২

॥ আমি ঘুমাইছিলাম ভালই ছিলাম
জাগিয়া দেখি বেলা নাই
আমি কোনবা পথে নিতাইগঞ্জে যাই॥১

যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রয়োজন নিয়ে জন্ম হয়েছিল ভাষার এবং সুরের, সেই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবার সঙ্গে-সঙ্গেই শিক্ষিত লোকজন অর্থাৎ আমি-আপনি নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে শুরু করেছি মধ্যবিত্ত বাকপটুতায়। আমরা লোকসংস্কৃতিকে পাত্তা দেব কেন। আমার ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারের ওপরে অনেক সময় বাঁকুড়ার ঘোড়া রাখা থাকে। কোন লোকসাংস্কৃতিক চৈতন্য বা সামাজিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি হিসেবে তা থাকে না। ওখানে ঘোড়ার বদলে একটা নীলরঙের ফুলদানিও থাকতে পারত। আমার এই মানসিকতার মূল কারণ কিন্তু পূর্বোক্ত উন্নাসিকতার জের টেনেই এসেছে। এবং যেহেতু মাটির যোগাযোগটা অনেক কম সুতরাং এই তৃতীয় পর্যায়ের উন্নাসিকতা কিন্তু আমাদের মূল সমাজধারা থেকে আরেকবার দূরে নিয়ে যাবে। অন্যদিকে আজকের স্বাভাবিক গ্রামীণ সমাজের সমস্তরকম অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বদলের অনেক আগে শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রেডিও পৌঁছে গেছে গ্রামে। অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষ মানসিকভাবে industrialization-কে আমন্ত্রিত করবার অনেক আগে urabanization-এর একটি মারাত্মক উপহার পেয়ে গেছে—রেডিওকে। গ্রামীণ লোকেরা ক্ষার কাচতে বসে সানলাইটের বিজ্ঞাপন শুনেছে। শহুরে সভ্যতা বা urban culture অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ফলে গ্রামীণ লোকেরা হয়েছে আধা-শহুরে। আর শহুরে লোকেরা একটা অদ্ভুত আধাগ্রামীণ লোকজনের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পা-মিশ্রিত বৈরাগী মানসিকতাকে লালন করেছি। ব্যাপারটাকে আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক্।

কম্যুনিকেশন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যায় বেড়ে। আর মানুষের মধ্যে এই সম্পর্ক যতো বাড়ে, স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান-প্রভাব যায় বেড়ে। যার ফলে আমরা যাদের মাটির সংগে যোগাযোগ কম, তাদের পক্ষে এই বাইরের প্রভাব কতোটা তা বুঝতে পারি না। যার জন্যে এমন ঘটনাও ঘটে যে অপুর সংসার দেখতে বসে বাঁশিতে 'যদি তারে নাই চিনিলে'-র সুর শুনে দর্শকদের মধ্যে কেউ-কেউ চিৎকার করে ওঠে 'তেরে মেরে.....', যেহেতু উভয় গানেরই সুর এক। ঠিক এই সমস্যাটাই আমরা দেখতে পাই লোকসংগীতের ক্ষেত্রে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া বা গাড়িয়াল বন্ধুর গানে 'বন্ধুরে.....' বলে যখন একালের পল্লীসংগীতের গায়ক ভাটিয়ালির টান দেন, তখন আমরা এই ভুলটাকে কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না। আর এই ঘটনাটা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু একালের সেই গায়ক রেডিও-তে ভাটিয়ালি শুনেছে—শুনেছে নিদেনপক্ষে অমর পালের রেকর্ডের গান। আমরা শিক্ষিত এবং লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অশিক্ষিত দর্শক সেটা শুনি। গান জমে গেলেই হলো। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা ভুলতে শুরু করি ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালি বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কী কী বোঝায় না। যেহেতু লোকসংগীত মানুষের মাটির গান, তার একান্ত নিজস্ব ভ্রান্তিভরা প্রাণের গান, অশিক্ষিত মানুষের গান, তার কথা এবং সুরে যেহেতু সেই আঞ্চলিক ভূগোল, ইতিহাস, বিশ্বাস, সমাজধারণা এবং কিংবদন্তী প্রভাব ফেলে, সেইহেতু কথা, সুর আঞ্চলিক শব্দব্যবহার বা ডারলেক্ট বলদাতে শুরু করলে শেষপর্যন্ত সেই অঞ্চল এবং তৎকেন্দ্রিক সমস্যা-

১। উত্তরবঙ্গের সাধুয়ালী গান।

গুলো হারাতে শুরু করে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কাব্যগুণ প্রবল নয় বলে শিক্ষিত সমাজের কাছে তার পরিচিতি (identity) হারিয়ে যায়। লোকসঙ্গীত এইভাবেই হারিয়ে যায় লোক থেকে। এবং যে শ্রেণী-চেতনা অথবা গণমানসিকতা মূল লোকসংগীতের ভাববিশ্লেষ করে, তার সংগে জলসায় গাওয়া গানের কোন মিলই থাকে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা নাক সিঁটকিয়ে বলেন এগুলো লোকসংগীত নয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসে বলেন—দারুণ এবং বেরিয়ে এসে হারিয়ে ফেলেন সেই লোকমানসিকতাকে। উভয় চিন্তাই যথার্থ!

যে কথা আগেও বলেছি, গ্রামের এই শহরমুখিনতা যার জন্যে শিক্ষিত সমাজের অনন্ত চাকচিক্য দায়ী, সেই আগ্রাসী জোয়ারে যদি এইসব সম্পদ মরে যায়, শিক্ষিতসমাজের কোন গন্ধমাদনেই এর বিশল্যকরণী খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে গেলে লাগে টাকা। লাগে ক্যামেরা। টেপরেকর্ডার, জনবল ইত্যাদি। তবু সবার আগে যা লাগে তা হলো ইচ্ছে। যাঁরা বলেন, এ পোড়া দেশে কিস্যু হয় না তাঁদেরও একটু সচেতন হয়ে উঠতে অনুরোধ করি। এটুকু শুধু বলি যে লোকসংগীতকে সংস্কৃতির প্রথম ধাপ হিসেবে মনে করুন। চকমিলানো মার্বেল পাথরে তাকে ঢাকবেন না। যেমন আজকাল কোন কোন দল করেন। দৃষ্টিনন্দন করে তোলবার জন্যে আজকাল কোন কোন দল কোলকাতা শহরের বুকে বসে রিহার্সাল দিয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে লোকসংগীত গণসংগীতের অনুষ্ঠান করতে যান। তাঁরা গাইবার সময় তাঁদের গায়েপিঠে লাল-নীল আলো পড়ে; পিয়ানো এ্যাকর্ডিয়ানের জি শার্পে মিউ-জিক বাজে। কলকাতা শহরে হলে তো আমরা সেগুলো টিকিট কেটে দেখতে যাই। শহুরে আদেখলেপনা আর রোবসনের ক্রস্-রেফারেন্স টানা ভাবালু পাঁয়তাড়ায় সমাজ বদলের সংকল্প ঘোষণার মধ্যে দিয়ে এইসব লোকসংস্কৃতির মিডলম্যান প্রতিম সংস্থাগুলো ('দালাল' কথাটা বড্ডো খারাপ, তাই...) বেঁচে থাকে। রেকর্ড কোম্পানীরা লোকসংগীতের রেকর্ড করান এমন কাউকে দিয়ে যাঁর গলায় লোকজীবনের কোন ছাপ নেই। সাধের লাউ-এ বানানো ডুগডুগির আওয়াজ এ্যাকর্ডি-য়ানেই বাজুক।

স্টেনোগ্রাফি জানা এক বান্ধবীর কাছ থেকে আমার এক বন্ধু টাইপরাইটারে ছাপানো প্রেমপত্র পড়তে পড়তে তার বান্ধবীর হাতের লেখা ভুলে গিয়েছিল। আমার বন্ধুটির অবস্থা আমাদের সবার থেকে বোধহয় খুব খারাপ নয়।

৩

॥ কিও বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে —
কোনদিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও রে॥১

এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে লোকসংগীত বা লোক-সংস্কৃতি রক্ষা করার দায়িত্বটা বড়ো সহজ নয়। এবং এর প্রচার সম্পর্কীয় সবচেয়ে বড়ো যে মাধ্যম রেডিও, সেখানে আমরা সত্যিকারের লোকশিল্পীর কজনকে পাই সন্দেহ আছে। অর্ধেক গানের উচ্চারণ ঠিক হয় না। উচ্চারণ ঠিক হয় কথা ঠিক থাকে না। কথা ঠিক থাকলে সুর ঠিক থাকে না। তাঁরা যেহেতু শিল্পী এবং ছাপ-মারা, অতএব কিছু বলা যায় না। শ্রুতিনন্দন করে তুলবার জন্যে তাঁরা যে কোন মারণাস্ত্র প্রয়োগ করেন, যে কোন পর্দা লাগান। খামকাই যে কোন জায়গায় গলা ভেঙে দিয়ে, কথার মধ্যে অতিরিক্ত অক্ষর (বন্ধু > বহন্‌ধুউ) লাগিয়ে ভাবেন মহৎ কর্ম সম্পাদন করলেন। একই গায়কীতে ভক্তিগীতি, লোকগীতি, রজনীকান্ত মায় আধুনিক গান করেন। সেখানে ঢং, মর্যাদা, লজিক কোন কিছুর বালাই নেই। খোঁজ করলে সেইরকম গানের মাষ্টার পাওয়া যাবে যিনি সকালে করেন নজরুল-গীতির আর বিকেলে লোকগীতির ক্লাস। ব্যাপারটা আমাদের পাড়ার গগনের পিসেমশাই-এর মতো। তিনি সর্দিজ্বর হলে সকালে খেতেন হোমিওপ্যাথী, দুপুরে এ্যালোপাথী, বিকেলবেলা কবিরাজী আর রাত্তিরে টোটকা!

উন্নাসিকতা, উদাসীনতা এবং ভুল মানসিকতা নিয়ে যাঁরা এতোকাল চলে এসেছেন তাঁদের, এই আমরা অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত লোকজন, উপেক্ষা করে যদি একটু সচেতন-

---

১। মইষাল গান (উত্তরবঙ্গ)।

ভাবে গোটা ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করি তাহলে এর সংরক্ষণ বা যথাযথ প্রচলন এমনকি লোকজীবনের স্পিরিটটা অন্তত বুঝতে পারব। তবে সমস্যাও আছে। প্রথমত আঞ্চলিক অভিধান নেই। দ্বিতীয়ত উচ্চারণ শুদ্ধতা সম্পর্কে রিসার্চ নেই। তৃতীয়ত প্রাচীন গায়ক-গায়িকারা সচেতন নন। চতুর্থত তাঁদের যোগ্য বংশধরেরা আপাতত অন্য কাজে ব্যস্ত। তবুও কিছু করা যায়।

আধুনিক গানে, চিন্তায় এইসব গানের মধ্যে পুরো-পুরি আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীজাত ইমেজারীর প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এই কাজটা সলিল চৌধুরী, ভূপেন হাজারিকা করবার চেষ্টা শুরু করে-ছিলেন। লোকসংগীতের সুরের লজিককে বুঝে নিয়ে যেভাবে সলিল চৌধুরী ধানকাটার গান বা পাল্‌কীর গানে আরোপ করেছিলেন, তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু অনুসৃষ্টির (Transcreation) এই সময়ে একটা গণ্ডগোল থেকেই যায়। যেমন পাল্কীর গানে যে 'হুঁঃহুঁঙা' ধ্বনির প্রয়োগ করা হয় তার উদ্দেশ্য আমরা জানি—পাল্কীর চলমানতা আনবার জন্যে এবং বেহারার কান্তিটাকে ধরার জন্যে। তাদের পায়ের ছন্দ, ঝাঁকুনি, নিঃশ্বাসের টান ইত্যাদি মিলিয়ে এই ধ্বনিটার প্রয়োগ অথচ গান গাইবার সময় শব্দটা পরবর্তীকালে দেখেছি 'হুন্‌হুঁনা' হয়ে দাঁড়ায়। ট্রান্সক্রিয়েশনের এই শহুরে অসুবিধা কিন্তু কাটানো খুব কঠিন। এই ধ্বনির প্রয়োগ না করলে অজ্ঞতাজনিত দোষ আর প্রয়োগ করলে অক্ষমতাজনিত দোষ হবে। অতএব, লোকসংগীতের ধারাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমরা দুইরকম দোষ দেখতে পাই। এক, সময়ের সূত্র ধরে অগ্রগতি-কালীন অনিবার্য বিবর্তন এবং দুই, অনুসৃষ্টির অক্ষমতা।

আর এর বাইরে আরও একটা সমস্যা আছে। তা হলো শহুরে হয়ে ওঠবার চেষ্টায় নিজস্বতা হারিয়ে ফেলা। সাঁওতালডিহির শ্রমিকের ছেলের হাতে মাদলের বোল ওঠে না। শোলের রেকর্ড যে বালক শুনছে, তার বিস্ময়টা গ্রামোফোনের চাকতিটা ঘিরেই।

আর অন্যদিকে আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা মধুবনী ছবি কিনি বারো টাকায়, বিক্রী করি পঁচিশ টাকায়। সেটা যখন তারা টের পেয়ে যায়, ছবির দাম তারা নিজেরাই বাড়ায়। আর ছবির যতো দাম বাড়ে, কোয়ালিটি ততো কমে। আর আমরা অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা ট্রেন করে দিল্লী যেতে ধানের শিস্ হাওয়ায় দুলতে দেখে মনের ভেতরে একটা উদাসীন কবিতা তৈরী করি, গোটা ব্যাপারটাকে ভুল করে লালন করে চলি। সন্তান বড়ো হলে যখন বাপ দেখে তার মুখের সঙ্গে মিল নেই ছেলের মুখের, তখন কিছু করবার থাকে না—ছেলে কবে ধাই-মার হাতে পাল্টে গেছে, বাপ জানেও না। ভুল ছেলেকে মানুষ করে।

যতোদিন না পর্যন্ত আমরা অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত মুখের ঘোর কাটে, ততোদিন রবীন্দ্রসদনের ঠাণ্ডা ঘরে সুখী-সুখী জীবনের ভুল গপ্পোগুলোকে তুড়ি মেরে অবজ্ঞা করে খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ান। নিজেদের পাড়ায়, কলেজ ইউনিয়ানগুলো বিশেষত মফঃস্বল কলেজের ইউনিয়ানগুলোতে NSS, NCC-র মতো লোকসংস্কৃতির শাখা গড়ে তুলুন। জানি, একদিন হয়তো কেরী সাহেবের মতো আরেক কোন বিলিতি লোক এখানে লোকসংস্কৃতির যাদুঘর বানাবে। তার আগে যতোটা পারা যায় পুরনো লোকজন, মা-ঠাকুরমার কাছে, গান, ব্রতকথা, পাঁচালিগুলোকে সংগ্রহ করুন। কলেজ ইউনিয়ানের ঘরটাকে সাজিয়ে ফেলুন ছো-এর মুখোশে, সারিন্দা-দোতারা উঠুক বেজে। টেবিলের ওপরে থাকুক বেনেপুতুলের পেপারওয়েট। দরজার পাশে পাহারা দিক টেরাকোটার ঘোড়া। যারা স্বরলিপি করতে পারেন, তারা স্বরলিপি করে রাখুন। দশটা-পাঁচটার ক্লান্ত মানুষের প্রাণের গান, শ্রমের গান নতুন করে তৈরী হতে সময় নেবে। যতোদিন না সেই 'শহুরে লোকসংস্কৃতি' গড়ে উঠছে, ততোদিন আপনার টেপরেকর্ডারে বাজুক কমল মাহাতোর গাওয়া উদাত্ত গান, 'রনজান মুনহরার' প্রেমের গান।

নচেৎ গোলাপী আঙুলে শুধু—অর্গানই বাজবে। ঠিক সংস্কৃতিকে আমরা কোনদিনই ছুঁতে পারব না। 'কোন দিন আসবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে'!

প্রকাশনা-সচিবের কথা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রত্রিকার প্রকাশনা-সচিব হিসেবে কিছু লিখতে হবে। শুরুতেই যেটা সবচেয়ে দরকার, তা হলো—যে ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে আমাদের ছাত্র-সংসদে নির্বাচিত করে আজকের এই কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানানো, যদিও তা জানাচ্ছি প্রায় এই ছাত্র-সংসদের কার্যকারিতার শেষ সীমায় এসে।

দ্বিতীয় কথাটি মোটামুটি চিরাচরিত।—সেই "পত্রিকা প্রকাশে দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা"। কারণ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়েই বলছিঃ প্রেস-স্ট্রাইক ইত্যাদি কিছু টেক্‌নিক্যাল কারণ থাকলেও মূল কারণ গাফিলতি। সমস্যাটি চিরকালীন। সমাধান একটিই —আপনাদের আরো বেশী সক্রিয় সহযোগিতা ও গঠন-মূলক সমালোচনা।

"প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা"-র একটি ঐতিহ্য আছে। বহু পুরনো দিন থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশনা-সচিব, লেখক-লেখিকা হিসেবে নাম পাওয়া যায় বহু নামী-দামী লোকজনের। আজকে সেই পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ আমাকে এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীদের নিঃসন্দেহে গর্বিত বোধ করায়। তবে, বস্তুকে যত কাছ থেকে দেখা যায় ততই তো তার সম্পর্কে উপলব্ধি গভীরতর হয়! তাই আজ প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে কাজ করার "গ্ল্যামার" ভোগ করার সঙ্গে ঝক্কিও কিছু কম পোয়াতে হয় না! বিশেষত, অপর্যাপ্ত টাকার ভেতর খরচ কুলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। পত্রিকাতে কথাটা এইজন্যই বলা, যাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি একই সংগে এ-দিকে পড়ে, আর পত্রিকা-খাতে টাকার অংকটা কিছুটা বাড়ানো হয়। এটা অবশ্য নিতান্তই উত্তরসূরীদের দিকে তাকিয়ে "নিষ্কাম কর্ম"। এই পত্রিকার জন্য ভারপ্রাপ্ত আমাদের সেই "নুন আনতে পান্তা ফুরোয়"-এর মতন "প্রেসে টাকা দিতে কাগজ ফুরোয়"-এর মধ্য দিয়েই কেটে গেল।

অসুবিধার আরো একটি বিশেষ দিক আছে। ছাত্র-সংসদ কলেজের নির্বাচিত প্রতিনিধি, এবং সেই হিসেবে কলেজের মুখপত্রকে পরিচালনা করার প্রধান দায়িত্ব সংসদেরই থাকা উচিত। অথচ প্রতি পদে কর্তৃপক্ষের "Discretionary Powers" বড় কণ্টকর। ছোট্ট উদাহরণ দিতে গেলে, প্রথমেই মনে পড়ে—পত্রিকা-সম্পাদককে মনোনীত করার ক্ষমতা অধ্যক্ষের। এবারে সেজন্য আমাদের কোন অসুবিধা হলো কিনা প্রশ্ন সেটা নয়; ব্যাপার এটাই যে এটা অসুবিধার সৃষ্টি করতেই পারে! আর, এ শুধু কলেজ ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রেই নয়; সমগ্র ছাত্র-সংসদের সভাপতি হিসেবে অধ্যক্ষের "ভেটো-ক্ষমতা" সত্যি সত্যি সংসদের ছাত্র-স্বার্থে কাজ করার কতটুকু অবকাশ রাখে চিন্তার বিষয়। এটা নিঃসন্দেহে বর্তমান সংসদের দুর্বলতা যে, সে কলেজ সংবিধানের এই অন্যায় দিকগুলির বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংগঠিত করতে পারলো না। তবে শেষ মুহূর্তে এই মুখপত্রের মাধ্যমে এই আহ্বান সংসদ রাখছেঃ আপনারা সোচ্চার হোন্ এই অন্যায় কলেজ সংবিধানের বিরুদ্ধে এবং আগামী সংসদকে বাধ্য করুন এ-বিষয়ে পদক্ষেপ রাখতে।

কিন্তু নেতিবাচক দিক দেখানোটাই যথেষ্ট নয়। কাজ করার মধ্যে যে আনন্দ আছে, গর্ব আছে তা তো আগেই বলেছি। সংগে সংগে এ-কথাটাও বলা দরকার যে, সহকর্মী দুই যুগ্ম-সম্পাদকের পরিশ্রম ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীহীরেন চক্রবর্তীর অবিরাম সহযোগিতা

নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। আর যেটা ভীষণ ভাল লাগে তা হলো পত্রিকা সম্পর্কে কলেজের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর উৎসাহ—সে লেখা দেওয়াতেই হোক, অথবা নিয়মিত "কবে বেরুচ্ছে" খোঁজ নেওয়াতেই হোক্।

"সব কথা বলা হয়ে গেলেও শেষ কথাটা বাকীই থেকে যায়।" আর প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার জন্য লিখছি ভাবলে কলম থামতেই চায় না। তাও শেষ একটা কথা বলে থামতে চেষ্টা করছি।—যে কোন পত্রিকারই একটা উদ্দেশ্য থাকেঃ একটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারায়, একটা বিশেষ মূল্যবোধে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা সেই চিন্তাধারা বা সেই মূল্য-বোধকেই তুলে ধরতে চেয়েছি, যা মানুষকে আত্ম-কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে, চারপাশটাকে বিশ্লেষণ করতে শেখায় ও সেই অনুসারে তার ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে। উদ্দেশ্য সাধনে পত্রিকা কতটা সফল সে বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের ওপর রইল। তবে ব্যর্থতার সমালোচনা যেন নিশ্চয়ই আসে, যাতে ভবিষ্যতের কর্ম-পদ্ধতি উন্নততর হয়।

ধন্যবাদ

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়॥ মার্চ ১৯৭৯

সম্পাদকীয়

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে পড়ার অভ্যাসটা আমার জন্মগত। তাই, দীর্ঘ চার বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে কাটাবার পর বিদায়ের সময় যখন আসন্ন, তখন এই সম্পাদকীয় যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্মৃতি-রোমন্থন হয়ে পড়ে, পাঠক ক্ষমা করবেন।

বয়োজ্যেষ্ঠরা বলেন, কলেজে যাবে লেখাপড়া করতে। বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা অক্ষরে অক্ষরে যে শুনেছে, আমার বিশ্বাস, সে পস্তেছে। সুবোধদার ঘণ্টাকে নিয়তির নির্দেশ মেনে বহু ছাত্রই, জানি, শেষ কৈশোর থেকে মধ্যযৌবন পর্যন্ত সময়টা, সুখী বার্ধক্যের পথ সুগম করেছে। আমরা, যারা সংখ্যায় খুব কম নই, কিন্তু সেই সময়ের ফাঁকে ফাঁকে সাবেকী বাড়ির কোণগুলিতে ছড়িয়েছি। হে সর্বতোভাবে লেকচারোন্মুখ বন্ধুগণ, তোমরা জান না, তোমরা কী হারাইতেছ! সমকালীনরা সাক্ষী দেবেন, বর্তমান সম্পাদক খেলাধুলা থেকে ছাত্র-রাজনীতি পর্যন্ত কিছুই বাদ রাখে নি।

আমরা এ-পাড়ায় এসেছিলাম ১৯৭৪ সালে—তখন বড় অন্ধকার সময়। কিশোরসুলভ হৈ-হট্টগোলের ফাঁক দিয়েও ভাসা-ভাসা এসে পৌঁছত অন্যায় বাক্যরোধ, বিকৃত অত্যাচারের খবর। 'গণতন্ত্র' শব্দটা তখনও খুব কুয়াশাচ্ছন্ন—'মহত্ত্ব' সম্বন্ধে ধারণা বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ।

ক্রমে টেবিল-বাজানো দলবলের বাইরে অন্যলোকের পরিচয় পাই। তারা 'রাজনীতি করে'। দাদারা বোঝান (দাদারাও রাজনীতিবিদ) যে ওরা খারাপ, ওরা সমাজ-বিরোধী, আমরা তাই ওদের কলেজে ঢুকতে দিই না। অতঃপর দাদারা টেবিল বাজান।

এভাবেই কাছে আসে, প্রতিকূলতার মধ্যে, আরো লোকজন, যাদের সংস্পর্শে জানা যায় যে কলেজ মানে শুধু ক্লাসরুম নয়, শুধু আনন্দ-উৎসবও নয়—কলেজ মানে, আর পাঁচটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত, অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক অন্যায়, এবং তার প্রতিবাদ প্রতিরোধ। কলেজ মানে প্রতিবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম, অথবা অন্যায়ের সঙ্গে লীন হয়ে নিম্নমুখী পদক্ষেপ, অথবা নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে ক্লীবতাকে মেনে নেওয়া। সংবাদ-পত্রে চিঠি লিখে যে মূল্যবোধগুলির প্রবল জয়ধ্বনি করি, কলেজ মানে, সেই মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে সততাকে যাচাই করে নেওয়া—এবং কিছু সৌভাগ্যবানের ক্ষেত্রে, মহত্ত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

সেই অন্ধকার দিনগুলিতে, যখন সন্ধ্যার পর কলেজে মদের আড্ডা, প্রহার-নির্যাতনে 'গণতন্ত্র' নামক ঘটনাটির নাভিশ্বাস উঠছে, তখন আমাদের সাহস ও উৎসাহের মূল উৎস যে ছেলেটি, তার নাম তপন চক্রবর্তী। মারের ভয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠ যখন প্রায় রুদ্ধ, তখন তপন ও আরো কয়েকজনকে আমরা দেখেছি, পোর্টি-কোতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। এবং নিজেদের অক্ষমতার জন্য লজ্জা পেয়েছি। ১৯৭৭ অবাধ প্রবল অন্যায়ের যুগেও যে এ চত্বরে সুস্থ-সৎ রাজনীতির ধারা বিলুপ্ত হয় নি, তার কারণ এ ধরনের কিছু সৎ মানুষের ভীড়। আর, সে ধারা বিলুপ্ত হয় নি বলেই তো আজ, ১৯৭৯ সালে, প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে, পোর্টিকোতে, ক্লাসরুমে এমন নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে কথা বলা যায়, সেমিনার করা চলে, সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক সম্ভব হয়।

শেষ বেলায়, বিদায়ের সময় চোখের পাতা ভারী হয়। কিন্তু তার সঙ্গে আনন্দ থাকে, কৃতজ্ঞতা থাকে। এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস থাকে, কারণ সৎ, মহৎ মানুষ তো আজও সম্ভব।

গৌতম বসু॥ মার্চ ১৯৭৯

The Story of a Street

TAPATI GUHA THAKURTA

The casual spectator is mesmerised by the mere din of an incongruous variety of traffic, by the sheer weight of humanity flooding the narrow pavements and cobbled tram-tracks. Often, the eye even fails to escape the distracting barrier of pavement-stalls to the decrepit structures towering beyond. The Medical College with its row of sombre buildings and constant buzz of activity cannot but arrest the eye. But behind the seemingly impenetrable maze of roof-tops also loom in quiet anonymity the much-slandered walls of Calcutta University, the time-weary ones of Hindu School, Hare School and Presidency College. Life from the streets flow in and out of these premises. Yet above the hammering beat of the present, time seems to stand as inert as the ancient clock high up in the college wall, langouring still in the yellowed folds of tradition. And within the whirlwind of noise and activity, an indefatigable spirit effervesces with a character all its own.

This is College Street, apparently indistinguishable from the numerous others spreading around the dingy, emaciated countenance of North Calcutta. Given the chance, each of these would have a fascinating story up its sleeve. But in College Street the story inevitably transcends its surroundings into the wider firmament of a heritage that survives all the squalor with amazing tenacity. It is a heritage most intimately of Bengal—of a dying people struggling under the self-imposed burden of respectability, trying to beat the sordid stench of existence by the brittle fragrance of culture. So even from the dark depths of humble homes there pulsates the rhythm of the *tabla*, the rippling notes of the *sitar*. In a congested room a group of aspiring artists diligently attend evening classes, oblivious of the nerve-racking din without. And amidst the usual modest rows of clothes stalls, stationery and food stores, persists the subtle luxury of book shops—the most distinctive trade-mark of College Street.

The street is famed to be a students' haven ; it could claim to be much more. For this tin-roofed musty world of book-shops easily breaks its way out of the drudgery of prescribed text and examination-guides into the more scintillating world of the thinking and the innovative. In the second-hand shops, under a facade of dust and decay languish some of the rarest books found in the city, offering a veritable treasure-hunt to aspirants for knowledge in any conceivable field. Just off College Street, with its proud landmarks of the Coffee House and Sanskrit College lies Bankim Chatterjee Street, as happily lost in an unwieldly cluster of book-shops and pub-

lishing houses. Here, the young, dynamic Bengali literature breathes and splutters in a stifling maze of alleys. Here perhaps, as nowhere else, a book-seller quotes his favourite poet as intensely as he raves about the difficult times. And here, amidst all the hub-bub of the present, the past distinctively lingers in its own nooks. In a dark apology of a room, three generations cling to their meagre heritage of a book-shop, the tottering grandfather still priding himself on the possession of the oldest version of the *Chandimangala.*

The present pushes and stumbles through its hurdles, reluctant to forsake its one pride—the past. Charred and bruised, the spirit zealously clings to a slipping identity. So, typical of Bengali extravagance, the innumerable food-shops huddling around College Square continue to be crowded by an assorted people at almost any hour of the day. Traditional confectioners like Putiram still hold their prided place in the Bengali heart; the mouth-watering *Jalkhaabar* they offer alongside has lost none of its spice to the savouring tongue. What has ebbed, perhaps, is that luxuriant flow of life, that uncluttered sense of fulfilment which accompanied even the simplest meal. Yet, in the midst of all the decadence that pervades the mind, a quiet faith persists—a faith hovering over a mysterious footprint in the floor of an old sherbet-shop, finding refuge in gawdy paintings of deities that adorn every humble corner.

Like the rest of Calcutta, College Street too has its own stock of surprises. A deceiving calm prevails over College Square, disturbed only by passing footfalls and occasional shouts of urchins splashing in the vast pool. Yet on a lazy afternoon, in these same idle precincts, the innocent statue of Vidyasagar gets violently beheaded, red flags towering above the torrent of vituperation that follows. A soda bottle suddenly crashes against poster-festered walls. And a quiet routine of classes is disrupted by a trauma of violence and disorder that pushes yet another unobstrusive morning into the prominence of newspaper print. Often the sparks rise only to fade into oblivion in the minds of habituated students. But the street cannot forget. Every voice that trembled, every hand that bled, every ideology that bent a battered head, remains steadfast in its memory, for it is all a part of its tortured identity.

While bottled exurberance gives vent to shivering, frustrating spasms, it also finds more rewarding outlets in this world of queer contrasts. East of College Square is the dilapidated building of the Theosophical Society. Crowded in its library hall, far outstepping its shabby limits perform one of the most advanced and committed group-theatre of our times—the *Shatabdi* of Badal Sircar. The dingy nooks of Albert Hall houses no less a surprise. Climbing its ancient stairs, you suddenly come upon a non-descript sign that leads down a corridor into a wholly different world—a secluded show-room of books of Rupa publishers. Nor would anyone anticipate the extra-ordinary force of life that pulsates within the famous Coffee House. This place enshrines, perhaps, the most vibrant of all the traditions swarming around College Street. On sight, it would appear like any other eating-haunt, with busy waiters and a menu, ranging from coffee to delectable chicken omelette. Only here, ideas sell faster than the hottest *pakoras,* politics travel around more widely than a cup of coffee, arguments stimulate the air more strongly than the appetising scents. Disguested by delay and malpractice, backbroken by examination results, students still come here to spin away hours in frenzied discussion on love, life and politics. . . . However little its relevance to practical life, the main relevance of this *adda* lies as a balm to frayed nerves, as a revivor of cowered spirits. Traditionally, this Coffee House was the place where most of the young talent of Bengal germinated over a cup of coffee. Maybe, the

number of poets, scholars and patriots it produces now have become less and less, but the intensity of thought and emotion that is spewed around has by no means diminished.

It is this, more than any manifest achievement which embodies the true spirit of the place. It is the spirit of a people who have made the stories of the street their own... who love and belong to it with a touching solidarity. Somewhere, unconsciously a strange sublimity spreads its wings over all ill-feeling, political wrangling, frustration and disillusionment. A writer on Calcutta speaks of "a quiet co-existence between the two parallel lines of tram-tracks"—it couldn't be truer of College Street. Here amidst all painful incongruities yesterdays and tomorrows, hope and reality, illusion and circumstance co-exist and life runs its slow, unharrowed course.

Among shouting rickshaw-pullers and swerving buses, in canteens and book-shops, in examinations and agitations, and in the sweat and dreams of its people, the story of College Street unfolds itself. It is a narration which no single nightfall over the sleepless pavements can end. For this is the tale of a street that has long surpassed its visual identity to become an enigma, a challenge, a living, fighting tradition.

Two Poems

ASADUL IQBAL LATIF

1

What have we done
while the monuments
holidayed in the sun?

What have we done
while men burned like drenched branches?

What have we done
while the world swam in a certain destiny
and thirty-three million gods
kissed it repeated goodbyes?

What have we done
this long
while time ran faster than desire
and slower than the river on the canvas?

2

This life that I gave you
stares at me
in paintings and poems
coldly
like a false renaissance.

Till the time
we meet again
that lifeless crow
will not be eaten
by its startled friends.

Nor will people smile
at the fall of the mighty.

Focus on Eurocommunism

SUJIT BASU

"Communism as we knew it is extinct." This was an apt editorial comment made on the Eurocommunist conference in the "Democratic World". Gone are the days when world politics was dominated by the threat of a "Communist Revolution". Today, Communism as a single united movement is itself at the crossroads. After Yugoslavia and China, Communist parties of some of the Western countries have now come out of Moscow's fold, giving rise to the most burning issue of the day—Eurocommunism.

The Spanish Communist Party is by far the most outspoken exponent of independence from Moscow. At its ninth Congress held in last April, the Party discarded Leninism and democratic centralism—for long the two major ideological pillars of international Communist movement—and decided to designate itself as a Marxist rather than a Marxist-Leninist Party. "Democratic centralism," or exercise of absolute power by the few at the helm and total suppression of all dissent, will no longer be practised. Party workers will be free to air their views. Thus the Party will henceforth be governed by "democratic rule".

The Spanish Communist leader Mr. Santiago Carrillo's new book, *Eurocommunism and the State,* shows that so far as the goal of achieving the ideal socialist state is concerned, the Soviet system is a failure. As the situation in highly industrialized west European countries is quite different from that in pre-revolutionary Russia, a different approach to turn the west European countries into socialist states is necessary. The capitalist system as it has evolved in the developed countries is heading towards socialism ; all it needs is a gentle push from the Eurocommunists. There is no need for any other country's help. It is not the functiin of Eurocommunism to strengthen the Soviet military position. Mr. Carrillo rather suggests the creation of a European power bloc midway between the Soviet Union and the United States.

Mr. Carrillo denies that Eurocommunism is just a pose. It is a real, strategic development. He believes that ordinary parliamentary procedure can as well bring Communism. But he insists that democratic freedom and human rights must be respected before achieving communism, as they are "an unrenounceable achievement of human progress".

The book contains a frank criticism of what Mr. Carrillo thinks has gone sour in the Soviet Union in its march towards socialism. He refers to the Russian invasion of Czechoslovakia in 1968. On the question of the single party system in the Soviet Union Mr. Carrillo writes : "The confusion between

the party and the State seems to lead more to the construction of ideological images which cover up unsatisfactory truths than to the transformation of real situation." He argues that in the Soviet Union, "the bureaucratic layer wields at its various levels an unmoderated and almost uncontrolled political power. It decides and resolves matters over the heads of the working class".

There are high Communist officials who believe that there is something inherently wrong with the Soviet system. According to them, "centralization and dictatorship" which emerged in the Soviet Union justifiably in the early years of Soviet rule have not become obsolete. Some of the earlier Communist critics of the Soviet system said that it had turned into "State capitalism". Some of today's' Communist critics describe it as a "State-socialist system". "The defence of the State-socialist system", says Mr. Lombardo Radice, a member of the Italian Communist Party, "has become a vested interest of the Soviet leadership". Mr. Radice insists, the Soviet leaders must recognize that socialism cannot progress without taking risks. He draws a distinction between Soviet citizens, whom he sees as members of an enlightened, scientifically inspired and technologically advanced civilization, and their leaders, who embody "a persistent conservatism, an immobilism stemming from such ordinary characteristics as fear of change, fear of any kind of uncertainty". Mr. Radice thinks that the present Communist-ruled countries are suffering from a "crisis of uneven growth" leading to the unduly rapid development of some features of the system, while others are allowed to stagnate. "They have developed enormous heads intellectually, technologically and economically, but these heads are not supported by commensurate bodies in terms of political structure, cultural emancipation, civil rights, and so forth."

Any serious analysis of what went wrong in Russia leads to the apprehension of a recurrence of the same malady if Communists were to join West European governments. The Eurocommuists argue that economic and political conditions in western Europe today are so different from what they were in Russia at the time of the revolution that there is little danger of the Soviet "mistakes" being repeated. To the anti-Communists, however, Stalinism was not an accident of history, but the consequence of a type of beliefs still held by Communists today, the result of a system of organisation which inhibits dissent, the product of an economic philosophy which leads to the regimentation of society.

The Eurocommunists concede the need for a broad historical and sociological analysis of the present situation. There must be "complete freedom" for every kind of opinion. If Czechoslovak Social Democrats attend meetings of the Socialist International in the West, and Polish farmers join those of the "green international", there would be no danger in any of these. As Mr. Radice argues, after sixty years of socialist rule in Russia and thirty in eastern Europe, the people there would not want to turn the clock back.

Although in a sense the fathers of the concept, the Italians are cautious in defining Eurocommunism. According to Dr. Vittorio Orilia, a senior Party functionary, Eurocommunism is not a new political alliance or centre ; the Italian Communists have been working for "independence and pluralism" since 1946. Mr. Simon Sanchez Montero, Mr. Carrillo's deputy in Spain, said, "We believe we are the true followers of Marx and Lenin, adapting the concept to today's world and specific conditions". Mr. Theo Ronco, a member of the French Communist Party's Central Committee, pointed out that the term as such was unexceptionable, though the Japanese Communists had enlarged its geographical connotations.

Eurocommunism is the culmination of an evolution of ideas and changing conditions in

Europe as well as the Communist Parties' desire to achieve ptwer. The Communists' disillusionment with the Soviet concept got fillips from the Yugoslav assertain of independence, the Sino-Soviet rift, and the Soviet meddling in Czechoslovakia. Each of these events convinced the west European Communists that to try to import the Soviet brand of Communism into their countries would bring them nowhere near power even in the distant future. So they began drifting away from Moscow, steering clear of the sacred dogma of the Dictatorship of the Proletariat. By striking up nationalist postures they stressed their freedom of action. The French Communists supported their country having the nuclear striking force and the Spaniards accepted their king. They also declared their intention to participate in the parliamentary system. In a sense it marked the triumph of the modern nation state. The historic Madrid Declaration of March 1977 promised the Eurocommunists' respect for human rights, universal suffrage, political plurality and individual freedom.

Besides the term being imprecise, Eurocommunism is a nascent concept. The Russians also object to it inasmuch as it implies a specified brand of Communism. To the Russians, there can only be one Communism. It is queer that the Yugoslavs endorse this stand. According to them, there is no Eurocommunism as there is no such entity as Balkan or Yugoslav Communism.

Apparently, Eurocommunism is a struggle against rigidity and for seeking emancipation from any predetermined order. The Italian Communists stressed this point. In Madrid, Mr. Sanchez Montero maintained that Eurocommunism was not against the Soviet Union, but different from what was practised there. Mr. Ronco of the French Communist Party explained the concept in the context of the similarity of problems faced by the Communists in the capitalist world. "There are more people exploited today than before because of monopoly capital. We do not repudiate Leninism. We do not reject wholesale what had been done, but only certain procedures that repudiated democracy". Another distinguished French Communist was more graphic : "We think the best way to be true to Marxism is not to treat it as the Bible or the Quran or the answer to all situations. Marxism is a science to be enriched like all sciences. The best way to be a Marxist is to consider the national situation".

If Marx wrote his creed for western Europe and it found its way to Russia, the "Europeanization" of Communism should naturally imply that it would return to the West divested of both Leninism and Stalinism. The Eurocommunists are, however, hesitant to dispense with Leninism. At most they say that they are "revising" Leninism to make it conform to modern developments. Possibly that would be much too radical a course for the European Party leaders, who have already drastically redefined the principles of Marxism-Leninism.

Domestic political conditions have influenced the ways in which the west European Communist parties have sought to achieve their aims. The evolution of the Italians' ideas on communism can be traced back to Gramsci with his concept of a "historic bloc". Togliatti came up with his idea of an "anti-fascist bloc" and his thesis on polycentrism leading to Mr. Enrico Berlinguer's present policy of a "historic compromise." Because of their impressive work in city and regional administration, the Italian Communists secured just over 34% votes in the last general election. Mr. Berlinguer first supported the minority Christian Democrat Government through abstention leading to the election of a Communist speaker of parliament and to the six-party agreement, signed by the Communists last year. Today the Italian Communists, a "Party of Government and struggle", are for the Common Market and NATO. The Party,

no longer only of workers, now comprises the middle classes.

Things are not sailing so smooth with the Spanish Communist Party. It won only about 10% of the votes in the country's first free election in four decades last year. The Spanish Communists were black-listed during the French régime and the older generation still remembers the trauma of the civil war. The Army, after expressing its displeasure over the recent legalization of the Communist Party, keeps watch on political developments, and the Spaniards are always susceptible to the fears of an army coup.

In France, the Communists under Georges Marchais had joined the Socialists in a Left Front to fight the Republican-Gaullist alliance of President Giscard and Mr. Chirac. Opinion poll, which had forecast a leftist victory, proved wrong when the Republican-Gaullist camp won the election held in March this year.

There are, of course, differences of approach and emphasis between the French, Italian and Spanish Communist parties. But all of them have this in common that they must acquire wider credibility and this cannot be done without stripping the totalitarian garb which they have inherited through their association with Stalinism and the suppression of freedom and of dissidents. This association is damaging as well as unfair to them, for the Eurocommunists have been quite effective in protesting against some of the excesses of the Soviet secret police and in having police orders revoked by the Kremlin.

Yugoslavia, which had ignited the first spark of freedom from Soviet tutelage, has particularly warm relationship with the Italian Communists. Yet Belgrade is not much happy with the Eurocommunists' way of action. For in their zeal to acquire credibility at home the Eurocommunists are stressing their acceptance of bourgeois virtues rather than charting, like Yugoslavia, a self-management course.

The super powers are generally hostile in their attitude to the Eurocommunists. The "Sonnenfeldt Doctrine", propounded by Dr. Kissinger's' deputy in 1976, stemmed from the fear that the present "unnatural" relationship between the countries of eastern Europe and the Soviet Union was a "far greater danger to world peace" than the conflict between East and West, because it could explode sooner or later, thereby "causing World War III." President Carter's administration has moved away from the Kissinger treatment of Eurocommunism. Though an element of this line of thinking still prevails, President Carter's approach to the problem is more ambivalent and U.S. officials have had meetings with French and Italian Communist functionaries.

The prospect that the Eurocommunists would be able to speak with a united voice and influence the policies of their governments causes great concern to Dr Kissinger, who keeps issuing warnings, even out of office, about its possible effect on the U.S. position in Europe. The Kremlin is also afraid, not only of Eurocommunist pressure for internal reform, but of a Eurocommunist foreigh policy that might take an anti-Soviet direction.

The Mossow weekly *New Times* has bitterly attacked Mr. Santiago Carillo's book on Eurocommunism. It cites Mr Carrillo's hope that Eurocommunism could help create a united Europe that would play the buffer between East and West. This, according to *New Times*, is Mr Carrillo's design for "a force opposed primarily to the socialist countries". Mr Carillo's call for a European defence arrangement is viewed by Moscow as endorsing "the imperialist policy of arming Western Europe against world socialism, a policy of alliance between European and American reaction." These strong words are also meant to apply to the Italian party which is in favour of Italy's retention of NATO membership. Mr. Carrillo, too, *New Times* recalls, favoured the entry of Spain into NATO.

Obviously the Soviet Union is unhappy over developments in west Europe, especially because of the effect Eurocommunism could have on east Europe. An article in *Pravda* recently warned that Communist parties which ignored the creed of Marxism-Leninism "doom themselves to wander in the dark." "Eurocommunism", in its view, "serves the blackest purposes of reaction". The Russians, however, are showing some forbearance presumably because of a recognition in Moscow that any other course would take the Eurocommunists further away from the erstwhile centre of international Communism. The *New Times* attack on Mr. Carrillo's book, however harsh it was, gave the impression of being written more in sorrow than in anger. Sangfroid is thus the chosen course of the Russians in their approach to Eurocommunism.

It remains to be seen whether Euro-communism can make a dent on Moscow's east European allies. When the Moscow weekly condemned Mr. Carrillo's pluralist deviations, the party newspapers in both Hungary and Poland failed to support the Kremlin line with the enthusiasm shown by such hardline satellites as Czechoslovakia and Outer Mongolia. The Polish party paper, *Trybuna Ludu*, simply reprinted the *New Times* article without any supporting comment of its own. The Hungarian party paper, *Nepszabadsag*, refrained from using the kind of offensive language that Moscow used and said that Mr. Carrillo's attitude might cause damage to Communist interests "regardless of the intentions" with which he started.

The Hungarians and the Poles feel that their cultural links with western Europe are far older than their political ties with Moscow. The European democratic traditions of Western Communists have greater appeal for them. Hence their occasional flirtation with Eurocommunism, which, they hope, might in due course provide both the example and political leverage that would help them to overcome Moscow's objections to the liberalization of their own systems.

Academician Arnosht Kolman, on resigning from the CPSU after fifty-eight years, said, "Perhaps the greatest tragedy of the Communist Revolution is that it began in Russia: the Russians merely adapted all the evil forces of the Tsars and use them till this day." Eurocommunism is an offshoot of this blunder of Soviet policy makers. The ultimate success of the Eurocommunists would depend on their ability to retain an independent stance. For the present, we may remain assured with Mr. Enrico Berlinguer's bold comment—"We don't want to leave one bloc only to enter another."

Human Rights and the International Power Game

RAHUL CHOUDHURI

During the last one year, the issue of human rights has become a major theme in world diplomacy. The current human rights drive really began with the Helsinki Accord on European Security and Cooperation (1975). In part iii of this document the thirty-five signatories pledged to improve their human rights performances by easing travel restrictions, lowering the barriers to human and cultural contacts, speeding the flow of information, and improving working conditions for foreign journalists. However, it was only after Jimmy Carter was elected President that the human rights crusade became the most perceptible and vocal element in American foreign policy.

Only a week after the Inauguration, a U.S. State Department spokesman announced that any attempt by the Kremlin to intimidate dissident Russian physicist Andrei Sakharov would not "silence legitimate criticism of the Soviet Union". Within six weeks of taking office, President Carter dispatched a sympathetic letter to Sakharov and received the exiled Soviet dissident Vladimir Bukovsky at the White House. He announced that he would trim or eliminate U.S. economic and military aid to human rights violators. Thereafter, the new Administration began to issue a flood of statements, condemning alleged human rights violators in Russia, East Europe, and other perts of the world. Explaining his attitude, President Carter said, "With regard to human rights, let me emphasise that it is a very deep commitment on my part. When I took office I felt our country needed to re-establish some of its unique and admirable characteristics in a public way, to again be a beacon light for freedom, for basic human dignity. Not only was this a commitment within our own borders, but it was something we should support around the world". President Carter's stand has focussed world-wide attention on the human rights problem, and the implications of his impassioned campaign are gradually becoming clear.

For one thing, Washington's relations with Moscow have been seriously strained. Soviet leader Leonid Brezhnev and his colleagues greeted the initial American human rights initiatives with a blast of indignation and hinted that nuclear arms limitations and other vital features of detente could be imperilled. But, as President Carter continued to single out specific instances of infringement of civil liberties in Russia, the incensed Soviets prepared a counter offensive: a catalogue of alleged human rights violations in the West. Lengthy articles appeared in *Pravda* and *Izvestia* describing sectarian violence in Ireland and the inferior status of negroes in the U.S.A. When the case

of Anatoly Scharansky (the Jewish activist accused by Moscow of working for U.S. intelligence) brought forth numerous American protests against allegedly trumped-up charges, the standard Soviet response was to complain that the U.S.A. too, had political prisoners who had been sentenced on trumped-up charges. They cited the case of the "Wilmington Ten" in North Carolina. This group of civil rights activists comprising nine black men and one white woman was sentenced seven years ago to a total of two hundred and eighty-two years' imprisonment on charges of arson and conspiracy. The U.S. Department of Justice has lately found many irregularities in the way they had been tried and has suggested that they should be pardoned. However, Governor James B. Hunt of North Carolina has refused to do so for fear of losing the conservative votes he needs to win re-election.

As the two super powers traded blow for verbal blow over human rights, relations between them speedily deteriorated. Brezhnev's long anticipated return visit to the U.S.A. was repeatedly postponed. In more recent months human rights has become linked with the drastic hardening of the American attitude towards Soviet and Cuban activities in Africa, and relations have soured even more. The long delayed SALT II agreement for restraining nuclear armaments has been shelved, certainly for the rest of this year and conceivably for an indefinite period. Since world security depends upon super power understandings in the military field, all nations are affected by this breakdown in nuclear negotiations. Educational, cultural and scientific exchanges which earlier had been agreed upon to nourish better relations have begun to wither. Mutual suspicion and distrust are rampant.

Although most Governments subscribed to the United Nations' 1948 Universal Declaration of Human Rights, its interpretation varies from country to country. This factor lies at the root of U.S.-Soviet differences on the human rights issue. The U.S.A. is concerned mainly with free speech, the right to travel, and freedom from arbitrary arrest, but Communist countries and many underdeveloped nations do not define human rights in terms of the individual liberties cherished by Western democracies. Instead, they regard jobs, housing, education and food as primary rights. President Carter, however, has been trying to impose the Western viewpoint on the Soviet Union without considering the national legislation, regulations and practices in that country. This is to be contrasted with the less dramatic but more successful diplomacy of Dr Henry Kissinger, who had achieved more than all the previous Western statesmen who had come out in defence of human rights. Dr. Kissinger, the Soviet leaders have made plain, was a man who understood them, and with whom they could deal. His chief contribution towards improvement of ties with the U.S.S.R. was the Helsinki Accord. His success was due to the fact that he took note of the Soviet view and tried not to adopt uncompromising attitudes. It seems that Carter has not yet learnt this lesson.

Moreover, it is doubtful whether Carter's present campaigning style will cause any improvement in the plight of Soviet dissidents. It may well be counter-productive for Washington to continue to make a public issue of human rights in Russia and in the countries of her allies. Past history has shown that whenever Soviet Russia has been pressurised by the Western powers, the invariable result has been a tightening of internal conditions. The first instance was the armed "Intervention" by a number of Western powers between 1918 and 1920 in an attempt to wipe out Communism at its birth. As Red Russia waged her first grim war for survival, the Soviet leaders had no alternative but to hammer out the machinery of the totalitarian state-organised terror by the secret police, the ruthless sup-

pression of all dissent and a monolithic Party controlling and unifying all activity, military and civil. It is possible that these pillars of totalitarian state power might well have been erected under the Soviet state in course of time. They may all have been implicit in Marxism, but it is highly unlikely that they would have been built as quickly and strongly Evolution in the Soviet Union would have proceeded much more slowly and with much greater moderation if the Western powers had not foolishly interfered in Russian affairs.

Again, after 1945, Western opposition to Soviet domination of Eastern Europe (vital to future Russian security) not only began the Cold War, but made the Russian and the new east European governments more authoritarian than they would have been ; more harsh, more repressive, and in a desperate hurry to press their peoples into a new mould. As Fleming puts it in *The Cold War and Its Origins*, "We shall never measure accurately how many people in East Europe were liquidated in one way or another because of the pressure of the Cold War."

Keeping these facts in mind, it would not be surprising if Carter's headlong rush to condemn human rights violations in the Soviet bloc goads Russia into a much tougher policy towards its dissidents in an attempt to prove that it cannot be intimidated by external pressure. If such a crackdown does take place, Carter's human rights push will only have increased the misery of Soviet dissidents, for the U.S.A. does not possess the power to prevent it. It would be naive to think that the U.S. President and his advisers remain unaware of this strong possibility. Indeed, the recent trials and summary convictions of such leading human rights campaigners as Anatoly Shcharansky and Alexander Ginzburg indicate that a fresh Soviet clampdown on dissidents is already under way. What then does Carter hope to achieve through his drive for human rights? A brief look at its general trends may provide the answer.

Rarely, if ever, does Carter criticise the authoritarian regimes of the Shah of Iran, Park Chung Hee of South Korea, Ferdinand Marcos of the Philippines, or the two General Zias of Pakistan and Bangaldesh. Far from cutting off aid to these countries, where human rights are virtually non-existent, the Carter Administration continues to meet their considerable economic and military needs. Indeed, Carter appears to be satisfied by the claims of such American allies as South Korea, Taiwan and Iran that human rights must be suspended to meet challenges from North Korea, China, and leftist revolutionaries respectively.

Nor has Carter uttered a word of condemnation against President Mobutu, the strongman of Zaire, who has ruthlessly weeded out all opposition to his tyrannical rule. Needless to say, the virulently anti-Communist Mobutu is a staunch ally of the Western powers ; a fact that has been confirmed by their recent military intervention in Zaire. Similar is the American attitude towards John Vorster's white minority regime in South Africa, where the principle of apartheid is an open negation of basic human values. The feeling in most Western capitals is that, however unpalatable Vorster's treatment of his eighteen million black subjects, the West should not be too hard on Pretoria. After all, South Africa is a major trading partner of the West and is still one of the remaining outposts of "Western civilization". Its destruction might well leave the area open to Soviet infiltration.

To crown it all, Carter prefers to turn a blind eye to developments in his Latin American "backyard", where a string of ruthless military dictatorships (General Jorge Rafael Videla of Argentina, General Augusto Pinochet of Chile, and General Guisel of Brazil—to name only a few) keep the entire area firmly within an American sphere of

influence which is no less rigid than the Soviet sphere in east Europe.

These few examples suffice to show that Carter is inclined to ignore human rights violations in countries that toe the U.S. line. On the other hand, he is remarkably free with lofty pronouncements condemning violations in countries which follow a left wing line in international affairs and prove a source of discomfiture to American interests. Apart from his frequent tirades against the Soviet Union and her east European allies, Carter has condemned Vietnam, Laos and Cambodia as "perhaps the worst human rights violators in the world." These three countries, it may be remembered, inflicted upon the U.S.A. its worst foreign policy humiliation in the post-war era. Singled out also has been little Cuba, which for nearly two decades has been valiantly resisting attempts at subversion by her giant American neighbour. Increasingly, the U.S. government has begun to look to international financial institutions as a source of human rights beverage. Recently it abstained on World Bank loans to Ethiopia, another pro-Soviet country from which Americans were expelled in 1974.

This blatant application of double standards makes it obvious that Carter, far from wanting to improve the condition of dissidents all over the world, actually intends to use Human Rights as a political weapon. As has been noted, Carter's first term as President has been characterised by a sudden deterioration in U.S.-Soviet relations. U.S.-Soviet rivalry, always evident even after the reduction of Cold War tensions, has become more keen. The direct use of armed force in this nuclear age is out of the question, and the rivalry has mainly turned into a struggle for peoples' minds. In this context the Human Rights Campaign is a great help to President Carter. The U.S.A. which under Truman took upon itself the role of a world policeman, now has a President who has appointed himself the world's moral guardian. By continuously attacking the human rights records of Russia and her allies, Carter hopes to discredit the Soviet Union in the eyes of the world and portray her together with her allies as "bad guys". On the other hand, by ignoring the human rights violations of America's own allies, Carter has been trying to build up their image as "good guys". Thus, by implication, America and her associates are democratic and good and Christian ; the Soviets and their allies are undiluted evil. It may be that some of Carter's allegations are true. Those in power in Cambodia, North Korea and Ethopia are not exactly known for respecting the rights of individuals, but this certainly does not mean that the U.S.A. and all her allies from Park Chung Hee to Augusto Pinochet are as pure as the driven snow.

The subject of Human Rights is more directly involved in American diplomacy towards east Europe. In this as in many other areas of foreign policy, President Carter seems to be increasingly guided by his White House Assistant for National Security Affairs, Mr. Zbigniew Brzezinski, a Polish refugee who has always looked upon the Soviet bloc in east Europe with disfavour. The Carter Administration has been most vocal in its criticism of the human rights records of such nations as Poland, Hungary, and Roumania who are principal associates of the Soviet Union in this region. This move, together with Carter's policy of improving American relations with each of these countries individually, is probably aimed at strengthening their desire for independence from Moscow.

Finally, it is also likely that Carter's obsession with human rights is intended to bolster his declining popularity at home. He is now being openly ridiculed as a man who never will be either nominated or elected to to asecond four-year term in the 1980 election. It appears that Carter is trying to off-set this

trend by adopting a highly moralistic tone in his foreign policy and by acting and talking tough towards the Soviet Union, thus giving the American public something to boast about in an uncertain post-Vietnam and post-Watergate era.

It is, therefore, evident that Carter has debased the idea of human rights by linking it inextricably with the power game. As it stands today, Carter's campaign appears to be a simple expression of anti-Sovietism which can have unfortunate consequences if carried too far. Dissidents and political sufferers all over the world should entertain no illusions in this respect. Until Carter stands up for human rights in every nation irrespective of its social system or its stance in the international arena, his partial and lopsided campaign will remain nothing more than a new American move on the chess board of international power politics.

A Middle-class Approach to Poverty: Pride and Prejudice

SUDIPTO DASGUPTA

In College Street Coffee-house, regarded as the intellectual seat of Calcutta, all sorts of problems are discussed by the progressive Presidentian. Seldom, however, do we find him seriously concerned about one question: the poverty of the Indian people. To be sure, he is aware of the problem, and no doubt he has felt occasional pity for the crippled beggar-child or the impoverished *rickshaw-wallah*. But he knows that this very unfortunate state of affairs will some day be taken care of, say, by a 'social revolution'.; in the meanwhile, his time at the Coffe-house is spent in discussions of Sartre's existentialism, while the somewhat different struggle for existence that goes on around him is relegated into second place. Some, however, are more concerned : they are not prepared to accept the automaticity of a social revolution but believe that they have to take a more active part, if it is to come about. Such people are seen to engage themselves in college politics. I have been in Presidency College only since 1974, but this, I suspect, has always been the story. But thirty years have passed since independence, and the misery of the people has deepend. What happens to those people who had once dreamt of a better world?

College-level politics can be a frustrating experience. Quite a substantial number of students come from middle-class and upper middle-class families—for whom college education is nothing more than the means of realising typically middle-class aspirations—and who, therefore, regard political activities inside the campus as a threat to those aspirations. Very soon, therefore, the young politician finds that he has created quite a number of enemies. This is not to obscure the fact that he himself is also quite often responsible for alienating himself from the general body of students. The band of sycophants—the strong-arm men of the college—that surround him and the tendency to engage in unnecessary violence is hardly helpful. Entry into college politics is often at the inspiration of a *dada* so that very soon conflicts between convictions and allegiance crop up. This forces the young politician to adopt contradictory positions that brings scepticism not only in the student body but also within himself. And, of course, many college-level politicians flirt with politics simply because it is 'progressive' : instances of firebrand politicians retiring with a comfortable job in the bureaucracy are only too numerous.

College-level politics, then, is an acid-test which many fail to pass. But this conception of ushering in a better world through college politics is essentially romantic and, like many romantic ideas, is dashed to pieces by the hard facts of reality. Unawareness of certain funda-

mental constraints and facts of reality explain, perhaps, why much political activity, even at a higher level, has come to naught. The basic constraints essentially originate from the fact that India has the administrative superstructure of a nation state without the integration of one. This lack of integration is evident in the absence of homogeneity among regions with respect to property rights in land, extent of industrial development, and so on.

Let us consider, for instance, the nature of property rights in agriculture. The *zamindari* system in eastern India created an extreme concentration of landholdings. The gap between the agricultural labourer and the owner-cultivator, accordingly, is not significant in this region. In the *ryotwari* regions of southern India, on the other hand, ownership is not so concentrated and many owner-cultivators practise capitalist farming. This heterogeneity in the class-composition of the rural poor makes the task of organising the rural masses all the more difficult.

Then again, at the time of independence, we inherited a state with considerable regional disparity in the extent of industrial development—with the coastal regions of Bengal, Maharashtra and Madras much more industrialised than the rest of the country. In the post-independence era, this regional disparity has increased. In the background of unequal regional development, conflicts between national monopoly capital and regional capital took on regionalist overtones which prevented any struggle against the bourgeoisie on a national scale.

Again, we would find that the regions to industrialize first were also the areas in which modern educational institutions first sprang up. This meant that positions in the bureaucracy were mostly taken up by members of the middle-class from these regions. Antagonism among the 'petty-bourgeoisie' of various regions is, therefore, quite strong ; and though political parties have a national banner, they have a regional existence. The ruling party can maintain unity because it is in a position to dispense jobs, but an opposition party does not have this privilege.

Last, but not the least, is the fact of India being an economy where there is not yet any significant division of labour on a national scale. This, together with the fact that the size of the industrial labour force is small compared with the total population, seriously diminishes the possibility of a nation-wide proletarian upsurge in the near future.

All this underlines the necessity to achieve rapid economic development in India today. The point actually is that the whole approach to the problem of poverty has to undergo a change. What is needed is a proper scientific approach, and not romantic and at times, bookish ones. Irrespective of the type of society we have in mind, there is no getting away from the question of rapid economic development within the present socio-political framework. Only that could give the economy the kind of integration necessary for a social revolution, and relieve the people till it came about. In the light of this, the assertion that there are inherent limitations to the development of forces of production within the present socio-political framework needs to be carefully examined.

The starting point of this kind of assertion is the class-composition of the Indian state. The Indian state is visualised as a class alliance of the (regional and national) bourgeoisie and the landlords, which derives its mass support from the 'petty-bourgeoisie' in a programme of capital accumulation under the façade of socialism. The petty-bourgeois view of socialism is typically a growth of the bureaucratic apparatus for policing big business, with its attendant features of jobbery, corruption and wastage. This wastage is added to the wastage due to unplanned investment which is accompanied by excess capacity and industrial recession. The result of this wastage is

inflation and increased taxes (mostly indirect), the incidence of which mostly falls on the poorer sections of the population. Thus Indian capitalism finds itself in a curious contradiction ; its own political weakness prevents unbridled capital accumulation while the growth of the public sector is limited by inefficiency and wastefulness. The result is stunted growth.

As an explanation of the sluggish growth of the Indian economy, such an analysis is very attractive. I shall go so far as to say that it even portrays the correct picture of the Indian economy, as borne out by the fact that the number of persons employed by the public sector has increased much more rapidly than in the private sector. Where I would differ, however, is in the assumption that any effort at economic development under the auspices of the state has *inevitably* to be of a nature as portrayed in this analysis. The enormous growth of the bureaucracy, the emphasis on jobbery and the attendant corruption and wastage, the inefficiency of public-sector enterprises—all reflect failure of the state to provide the correct solution that would promote growth : failure to identify the whole gamut of problems, failure to correctly establish the causal connection between problems and ascertain which are primary and which secondary (in the sense that secondary problems would automatically be taken into account when the primary problems are solved). The problem is in part reflected in the lack of consensus among economists regarding the appropriate development strategy to adopt. One of the crucial (often underplayed) ways in which the social sciences differ from the physical sciences is in their inability to perform controlled experiments, which are the surest means of resolving disputes. So long as economists have divergent views of reality, their policy prescriptions will differ and so long as they are short-sighted, these prescriptions will fail to deliver the goods.

When controlled experiments cannot be performed, the only way to resolve disputes is to look harder at reality, to broaden our understanding of reality. Much could be done in this respect. Just how much do we know of the poor tiller of the soil? How much do we know of his way of life, the state of his health, his religions, beliefs (attitudes and values), the conditions under which he tills the land, the *way* in which he tills the land? There are numerous other areas of social life where our information is inadequate. There is an enormous scope for sociological and econometric studies that will enable us to understand reality better. So long as the economist shuts himself up in an ivory tower, his mind will get enmeshed in a system of abstract relationships, and he will lose sight of the human being who is, after all, the object of his study.

One reason for the total neglect of this kind of study in India is that we live in an environment where there is very little pressure for such studies. The Indian middle class is a most peculiar phenomenon. It has its origin in a decaying landed aristrocracy. The total sense of detachment of this class from the poorer sections is due to this lack of any organic link with it. The poor tiller of the soil, therefore, continues to be an alien phenomenon to this class. The middle class never really "belonged", and its progressive economic decline could hardly have made it more conscious of a sense of responsibility towards the poorer sections. The narrowness of the Hindu religion, centred on the caste system in the past, and western cultural influences more recently have provided it with a set of values in which the poor tiller of the soil can never become an entity worthy of its consideration. The dilemma of the middle class has been a sense of insecurity resulting from the lack of any real power base. It is precisely this lack of security that has caused it at times to lean towards the masses, but this has not prevented it from aligning itself with the ruling class when the opportunity presented itself.

Albert Einstein

AMAL RAYCHAUDHURI

Some time ago, the newspapers carried a strange piece of news. The brain of a man, who died in 1955, has been carefully preserved through all these years and is still being studied by a variety of most sophisticated scientific methods. The man was none else than Albert Einstein, born on March 14, 1879 and let us in this centenary year try to understand why the study of his brain is considered so interesting.

Physicists in the late nineteenth century had developed a belief that the basic laws of nature had all been found out; what troubled them was "to calculate the next decimal place" and that was only to confirm an impressive agreement between theory and observation. However, an experiment, apparently very simple, seemed to turn the apple cart. The idea was to measure the velocity of the earth. This they tried to do relative to a special frame in which light travelled with the same velocity in all directions. Now if anybody moved relative to this special frame, he expected to find an aristotropy in the velocity of light and from a study of this aristotropy, he could determine his velocity relative to the special frame. Experiments showed that for the earth-bound observer, the velocity of light was the same in different directions, so that apparently the earth itself was at rest in that specially favoured frame. But we all know that the earth moves round the sun and so even if in September, 1978, the earth be at rest in the favoured frame, it cannot be so in, say, July or December, 1978. But experiments showed that at all the different seasons, light did travel with the same velocity in all directions for the earth-bound observer. The conclusion seemed irresistible that light, unlike everything else, has the peculiar property of moving isotropically relative to any observer, irrespective of his motion. Let us see to what a strange situation this leads to.

Let us consider that O, O′ are two observers; O′ moving relative to O along the lane OX. At the instant when O, O′ were coincident, suppose that there was a flash of light produced. Now when the light reaches X, accord-

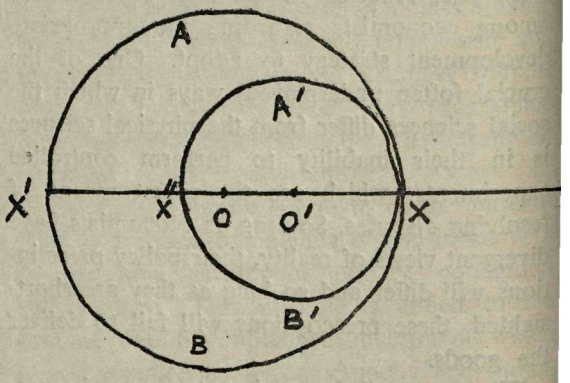

ing to O, light will reach all points on the sphere X AX′ B. But the light proceeds isotropically relatively to O′ as well—so according to O′ when light reaches X. It reaches all points on the sphere X A′ X″ B′ with O′ as centre. So,

(*i*) according to O, light reaches X, X′ at the same instant,

(*ii*) according to O′, light reaches X, X″ at the same instant and reaches X′ somewhat later. Thus events which are simultaneous to O are not so to O′ and the measurement of time according to O does not agree with O′'s reckoning.

Thus we come to one aspect of the revolution that Einstein brought in physics (or shall we say, philosophy) : the length of time internal is observer-dependent or as is more popularly said, the passage of time is a relative phenomenon.

Einstein introduced two basic postulates to take care of the new situation and these led to quite a number of important consequences. Here we mention only the most remarkable amongst them. Firstly, the mass of a body, the longituudinal dimensions of a body and the temporal interval between two events, all depend on the velocity of the observer. Secondly, there is an 'equivalence' between mass and energy in that there may be a transformation in either direction and the previously current principles of conservation of mass and energy became unified into a single conservation principle, where an imbalance in the account of mass may be compensated by that of energy and vice versa. We all know the importance of this mass energy squivalence. On the one hand we live under the agonising fear of an all destructive nuclear war and on the other hand we are welcoming the ushering in of an era with a promise of abundance of nuclear energy.

Einstein's genius did not stop here, he gave an altogether new idea of gravitation. Newton had taught us that gravitation was an attractive force and it caused an acceleration and in the important case of planetary motion, it gave us elliptic orbits in place of open straight lines along which the planets would have moved in the absence of gravitation. Einstein abolished the idea of gravitational attraction and extended the idea of straight lines. If we consider two points on a flat surface, we can join them by means of an infinity of lines but amongst them, the straight line is the shortest. Now, let us take a non-flat surface, say, that of a sphere. Again you can join any two points on the surface by an infinity of lines but you cannot call any of them to be straight. (Mind it, you are permitted to draw only lines which lie entirely on the surface of the sphere · just image that the points other than on the surface simply do not exist for you. To use a technical language, you space is the two-dimensional spherical surface). But still you can identify one amongst these lines which is shortest in length. These lines are called geodesics.

Minkowski had shown that Einstein's special theory of relativity could be given a beautiful geometrical interpretation if one considered the three space dimensions and time on a somewhat similar footing so as to obtain a four-dimensional "space-time". In special relativity this space-time geometry was similar to that on a flat surface so that you could draw ordinary straight lines. Now Einstein brought in the idea that in the presence of matter, the flatness is lost, but, of course, you can still have geodesies. These geodesies, according to Einstein, were the possible paths of material particles. His equations, called the field equation of general relattivity, determine the geometry of the space-time when the matter distribution is specified so that one can calculate the form of geodesics. In this way not only did he recover the familiar results of Newtonian gravitation and mechanics but also could explain a small anomaly in the motion of the planet Mercury which had previously

defied any understanding in the Newtonian scheme.

Scientists constitute a very sceptic and conservative community and they were not at all willing to accept the idea of a four-dimensional non-flat geometry (in more technical language, non-Euclidean geometry). However the observational confirmation of two predictions of Einstein made a great impression. Einstein predicted that light would also be affected by geometry and in passing near a star, a light ray would undergo a little bending. The other prediction may be explained as follows. If we examine the light emitted by an element (the emission may be obtained by a variety of ways like heating, passing an electric discharge, etc.) then the light is found to contain some specific wavelengths characteristic of the particular element. Suppose that the same element is emitting light on the surface of a star and also on earth. Gravitation is much stronger on the surface of the star than on earth (for this purpose the measure of gravitation is a quantity obtained by dividing the mass of the star or earth by the corresponding radius). Then Einstein's theory requires that the light from the star, when examined on the earth, will be found to have a wavelength slightly greater than the standard value on earth. As we have already stated, both these predictions were beautifully verified.

There was also another great challenge to the physics of the nineteenth century. Although the solution came in one great development—the advent of quantum mechanics—the trouble appeared in apparently unrelated fields. Thus one could not understand the thermal properties at very low temperatures, or the peculiar distribution of energy amongst different wavelengths in 'black-body radiation'. The physicist was also puzzled that to extract electrons from bodies by means of light, the wavelengths of light must be below a threshold value, irrespective of the intensity of light. Above all, there was the problem of the origin of light of characteristic wavelengths emitted by elements and indeed one wondered how the atom, consisting of charges of opposite sign, managed to survive at all.

The development of quantum mechanics came not at one stroke nor from a single man. The ball was set rolling by Planck who was himself very doubtful about his brain child—the hypothesis that in some way there is a discontinuity in the energy exchange between matter and radiation. To Einstein went the credit of extending the idea and showing that basically the idea of discreteness in energy could offer, an explanation of both the thermal properties at low temperature and the existence of threshold wavelengths in case of electron emission by light. Indeed it was this last work that won for him the Nobel Prize (Relativity, with all its successes and profound effects even beyond the domain of physics remained unrecognised by the august judges of the Nobel award).

Today, when nearly a quarter century has passed since the demise of Einstein, observations are revealing a universe which is much more mysterious than man ever imagined. There are the pulsars or stars predominantly of neutrons and with a mass similar to that of the sun but concentrated in a sphere of for kilometres radius ; the quasars apparently are pouring out enormous amounts of energy whose origin remains a puzzle and we are wondering whether there actually exist black holes which have a power to suck in everything but from 'whose bourne no traveller returns'. To crown all, we live in an expanding universe which was apparently born with a bang some ten billion years ago.

Will Einstein's theories be able to provide us with an understanding of all these or will it yield its place to some as yet unknown theory? Well, the future alone can tell.

A Ball, a Ship, a Clock, . . . and a Star

SUMIT RANJAN DAS

It has become customary to associate the word *relativity* with Einstein, but the idea of relativity is as old as modern physics itself. The idea originated with Galileo. The Copernican Revolution was nearing its completion and it was time to remove all objections to the Copernican scheme, particularly those associated with the motion of the earth. There was one outstanding problem : suppose you threw a ball vertically up into the air, fast enough to rise very high ; surely it couldn't fall down, to the same point from which it was projected, for during the time the ball went up and fell down, the earth had moved ! Though no one had thrown up balls fast enough, balls could easily be thrown up from moving ships. They were indeed thrown, and they all fell down exactly from where they were projected, provided the ship sailed smoothly, moving with a constant speed along a straight line. Thus the idea grew that somehow the ball was acquiring the motion of the ship.

Things are, however, different when the ship is accelerated. In that case, the ball does not fall down to the same point. We are thus led to suspect that "rest" and "uniform velocity in a straight line" are somehow equivalent situations and both differ from accelerated motion. This fact is embodied in Galileo's law of inertia (restated by Newton and known as the First Law of Motion). This law simply asserts the equivalence of rest and uniform velocity and distinguishes them from accelera tion by means of the idea of *force*. When you find that a body is changing its speed or direction of motion, or both, you say that there is a force acting on it.

This immediately solves (or rather this points to a solution to) our ball problem. If rest and uniform motion in a straight line are equivalent, a ship at rest is as good as a ship in uniform motion, and one might expect that a ball behaves similarly in both situations.

By solving our ball problem we have arrived at the Galilean Principle of Relativity. This principle simply extends the validity of the equivalence of rest and uniform motion to all laws of nature. You cannot perform *any* experiment that will distinguish a ship at rest from a ship sailing smoothly (of course, the latter is covered all over so that you cannot see the outside world).

There is a technical way of saying this, and that helps us immensely in stating facts more generally. Our two ships constitute what are called two "reference frames". To understand what that means let us discuss the following problem : suppose you want to tell your friend about an explosion you have seen (there is nothing special about an explosion, it can be anything interesting, and physicists call

anything interesting and worthy of communication an *event*). The first thing you must tell him is the place where it occurred. If you are an expert in telling that precisely and concisely (there are many people who can do that) what you do is essentially the following. First, you chose a *reference point*, say a tree, and then tell him : go half a kilometre north, and then five hundred feet east, and then rise fifty-five feet up in the air (the explosion may occur on the fifth floor of a building). Essentially, you have supplied your friend with three numbers. You can give him more if you like, but three is enough. This is what is meant by the statement that space is three-dimensional. The next thing you must tell your friend is the time at which it occurred. In all you have given him four numbers to specify an event. That means space-time is *four-dimensional*. That this is so was not proved by Einstein ; people knew about that a long time ago. What Einstein did was to show that the fourth dimension has some miracles to perform, and that is why the idea of a four-dimensional world is commonly associated with his name.

How do you measure these numbers? The first three, called the spatial dimensions, you measure out by a measuring scale. The fourth you measure by a clock. Instead of carrying the stick all the time you can think (and this is where scientific imagination comes in) that you fill out all space with a mesh of measuring scales and clocks. Then all you have to do is to mark out a point somewhere in the mesh and read the nearby clock. That is indeed easier. This mesh of scales and clocks filling out all space is called a *reference frame* by physicists.

In our newly learnt jargon, the principle of relativity may be stated as follows: *A reference frame at rest is equivalent to a reference frame in uniform motion.*

We are talking of rest and motion ; but in relation to whom or what? The mast of a moving ship is at rest relative to the ship, but surely it moves relative to the ground. One way out is to decide that we shall do all things relative to the earth. But that creates problems, and we shall not enter into these problems. We only note that the trouble arises because of the earth's rotation, and rotation is a troublesome motion. So we prefer to talk in terms of some stars that remain nearly "fixed" in the sky, and that makes things better. When we say that a body is at rest we mean that it is at rest relative to the fixed stars.

Now we must needs introduce another jargon : *inertial frame*. This is simply a reference frame that is either at rest or in uniform motion along a straight line with respect to the fixed stars. The Relativity Principle may now be restated as : *All inertial reference frames are equivalent*. Another way of putting this is to say that the laws of physics are the same in all inertial reference frames.

All was well with this principle until in the late nineteenth century electromagnetism and optics created troubles. It was found that electromagnetic laws looked different in different reference frames. In fact it was assumed that there existed a special reference frame, the "ether", in which we got a correct description of optical phenomena. Evidently this violated the Principle of Relativity. But it also did something else. It asserted that the velocity of light was different in different reference frames. There was nothing weird in that. It was well known that light was wave motion, and velocities of waves indeed depended upon the reference frame in which they were measured.

So people set out to prove the existence of ether in the following way. According to the ether hypothesis, the speed of light was the same in all directions only in the ether frame. For frames moving with respect to the ether, the speeds in the direction of motion and against the direction of motion must be different. As the earth moved through the

ether, such a discrepancy in the speed of light can be measured on the earth. These efforts resulted in something very strange : no such difference was detected.

Physicists were terribly confused. Various theories cropped up, until in 1905 Einstein interfered with a proposal that was even more weird. What Einstein asserted was this : why not be brave and accept the fact that the speed of light is the same in all reference frames as a law of nature? And why not assert that the ether is a fiction, and along with other physical laws, the laws of electromagnetism are also the same in all inertial reference frames? This is Einstein's Principle of Relativity. This was not something radically different from Galileo's version. It was, however, more confident, and it asserted that *all* laws are same in all inertial frames.

But the postulates of the constancy of the velocity of light had drastic consequences and brought about one of the most profound revolutions in physics. To appreciate that we look at things more closely.

Suppose you are to compare two events separated by a very large distance, say, two explosions, one occurring at Delhi and the other at Calcutta. How can you do that? You can say that we already have a mesh of scales and clocks filling out all space. All you have to do is note down the readings of the scales and clocks at the Delhi and Calcutta explosions. But then the two clocks at Calcutta and Delhi must be synchronised. If they are not, our clock-mesh is a bad mesh. How to do that? To do that you have to communicate between Calcutta and Delhi. For example you can ring up a friend at Delhi and tell him to set his clock exactly in accordance with your own clock. There lies the trouble. This is because information via the telephone wire takes some time to reach Delhi and your friend will set his clock wrongly. There would have been no problem if we had signals carrying information with infinite speed. We do not have that. But we do have a signal that has a finite speed which is the same in all reference frames, and that is light. Suppose you send a light flash from Calcutta. It takes a certain time to reach Delhi. Since the speed of light is constant, it takes the same time to come back to Calcutta. So what you do is this : you send a series of light signals from Calcutta to Delhi, get them reflected there and receive them back at Calcutta. One of these signals reaches Delhi just when the explosion takes place there (let us say that you can distinguish by some means this particular flash) and you note down the time after which it reaches you back. Let this time be t. Then if this particular signal was sent at time T, the explosion at Delhi occurred at the time $T + \frac{t}{2}$ Now you have a way to tell whether the two explosions are simultaneous. If the explosion at Calcutta occurs at time T′, the two explosions are simultaneous if $T' = T + \frac{1}{2}t$.

Now we shall see that something strange occurs. Suppose you have a rod and a light source at the centre of it. The rod is moving with respect to you along its length (you are fixed to an inertial frame). We send two flashes of light towards the two ends. We have an arrangement so that when the flashes reach the two ends, clicks are made. Further, as the flash in the forward direction (that is, in the direction of motion) moves, clicks are made at all points. Now do not forget that there is a background of measuring scales constituting your reference frame. So you also have an arrangement so that all the clicks make marks on the measuring scale along which it moves, and let us say that we can distinguish each mark from the rest.

What happens to the flashes to someone fixed with respect to the rod (i.e. someone who is also moving relative to you along with the rod)? To this observer, the rod is at rest and nothing can occur that can tell him that the rod is moving. That is what the Principle of

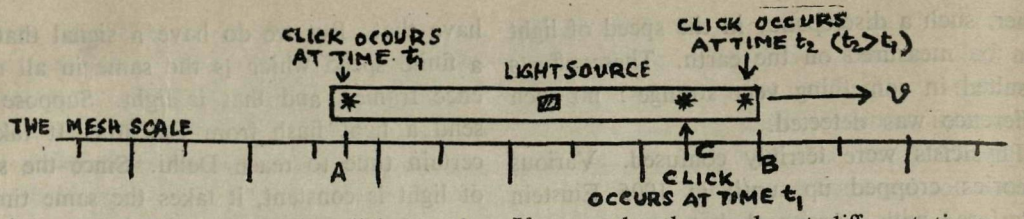

Relativity says. So to him, the clicks at the two ends are indeed simultaneous.

How does the experiment appear in your frame? While the two light flashes move from the centre to the ends, the rear end has approached the flash by a small amount, while the front end has receded from the flash by the same amount. But by Einstein's postulate, the speeds of the flashes are same in both the directions. So the flash reaching the rear end takes a shorter time than the flash reaching the front end. Thus to you the two clicks at the ends are *not* simultaneous. Note that if the speed of light was not constant, the speed in the backward direction would have been less than in the forward direction, and this would have compensated things so that the two clicks would remain simultaneous. It is the postulate of constancy of the velocity of light that brings out the breach of simultaneity. We thus arrive at the important conclusion that *events that are simultaneous in one frame may not be simultaneous in another frame.*

It is important to note two important points. First, if the rod moved perpendicular to its length, there would have been no problem. The ends would have neither receded nor approached the flashes and the two clicks would have been simultaneous all right. So the breach of simultaneity occurs only along the direction of relative motion. Secondly, there is no breach of simultaneity for events occuring at the same point. The problem arises only for points separated in space.

How do we measure the length of a rod? We place it along a measuring stick and mark out the positions of the two ends on the stick. But what happens when the stick is moving? If we make the marks at different times, our length measurement would be in a mess, since the length would depend on the time difference. Surely we would not like such a queer length. So we decide that we mark out the positions of the ends at the *same* time. This means that the markings must be made simultaneously. In our experiment the clicks were making marks on the mesh-scale. To the observer fixed to the rod, the clicks at two ends are simultaneous, and so he calls AB the "length of the rod". To you, however, the clicks at the two ends are not simultaneous. But surely, one of the clicks made by the forward going flash must be simultaneous with the click at the rear end. The click at the front end occurs later, and, therefore, the click simultaneous with the rear-end-click must make a mark on the mesh-scale at some point in between the centre and the front end. We call this point C. Thus, you will call AC "the length of the rod" and this is surely less than AB. So we end up in something fascinating : *The rod looks contracted when seen from outside.* It is evident from the above discussion that there would be no length contraction if the rod moved perpendicular to itself.

It is important to appreciate that nothing drastic occurs to the rod itself. The contraction is a result of the process of measurement. What the Relativity Theory asserts is that the definition of the length of a rod which we adopted is the only sensible definition.

There is somethiig which is even more strange. We consider a special kind of clock. This consists of a flashgun and a mirror. A flash is emitted from the gun, reflected from the mirror, and the moment it reaches back to the gun, another flash is emitted. So flashes

are emitted at regular intervals of time, and our clock is a clock in the true sense of the term. Let us now place this clock on a moving train so that the gun is on the floor and the mirror is under the ceiling. This we do in order to avoid complications of contraction of the distance between the gun and the mirror. (You can see that in this case the line joining the gun and the mirror is moving perpendicular to itself and hence there is no contraction). We view this clock from the ground (which we assume to be an inertial frame). So this clock moves through the mesh of scales and clocks (local clocks) fixed to us. We make an arrangement (we are very clever people; we can make all sorts of arrangements) so that every time our special clock ticks, *i.e.* every time a flash is sent, a mark is made on the mesh clock near it so that we can tell the time of the tick. In this way we can measure the time unit of our special clock by noting down the times of adjacent ticks.

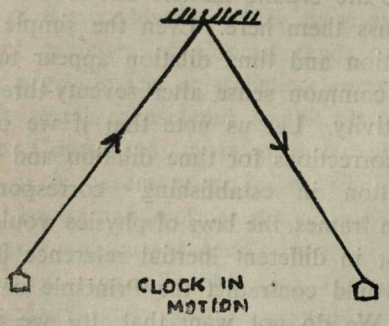

Since our special clock is moving relative to us, the light flash of the clock follows an oblique path. Since the speed of light is the same in all directions even when viewed from our frame, the light takes a much longer time than it would have taken if the special clock was at rest. However, to the observer fixed to the train on which the clock moves, the clock is at rest. Thus my measurement of the clock's time unit is definitely larger than his measurement of the clock's time unit. But both of us claim to measure the time unit of the clock, and so we do not agree. Thus we

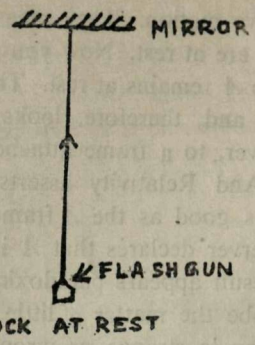

CLOCK AT REST

arrive at the third fascinating conclusion : *Moving clocks appear to run slow.*

One might object that it is improper to arrive at conclusions about time intervals in general from considerations of a special kind of clock. It is easy to see that nothing depends on the special nature of the clock. You can have any kind of clock you like. Suppose you have your wrist watch. You can surely build a special clock which sends a flash every time your watch ticks. Then if your watch and the special clock travel together, they always remain synchronised, since there is no relative motion between them. Therefore, if the special clock appears to run slow when viewed from outside, your watch must also run slow.

In fact, this time dilation is very general. It is valid for clocks in our body. Our body involves a complex of clocks, your pulse for example. Growth take place according to these biological clocks. Therefore, if your friend travels very fast in a spacecraft, you will find that he is growing old slowly and it is very likely that while you grow very old and weak, your friend remains young and strong. Don't worry : it needs fantastic speeds for such effects to be discernible—speeds of the order of the speed of light, and technology is far from achieving such speeds. So, that sort of thing is unlikely to occur in your lifetime.

We have seen how moving rods appear to be contracted, and moving clocks appear to run slow. Now we consider two rods A and

B in relative motion. They measure the same when both are at rest. Now you give a motion to *B*, while *A* remains at rest. Then *B* appears contracted and, therefore, looks shorter than *A*. However, to a frame attached to *B*, *A* is moving. And Relativity asserts that the *B*-frame is as good as the *A* frame. So the *B*-frame observer declares that *A* is shorter than *B*. The result appears paradoxical. However, if you probe the matter a little you will find that nothing is strange or wrong. When the man in the *A-frame* takes measurements, he uses his own definition of length, *i.e.* his own definition of simultaneity. When the man in *B*-frame measures he uses his own definition of simultaneity. We saw that simultaniety is a relative concept. So though both *B*-man and *A*-man claim to measure the same thing. they are actually measuring quite different things. And no wonder the results of measurement of different quantities are different. The same kind of paradox is posed by two moving clocks *C* and D. The *C*-frame man says that *D* is slower than *C*. The *D*-frame man says that *C* is slower than *D*. It is evident that this too has to be explained in the above manner.

We have talked a lot and it is time we looked back. We started with the principle of relativity and saw how Einstein reasserted its truth together with the postulate of constancy of the speed of light. Nowadays people believe that the latter postulate is actually a redundance. This can be deduced from the relativity principle and other general considerations. That is, however, beyond the scope of this article. Anyway this fact tells us something very important. If we are to compare the results of the measurements of the same phenomenon made by frames in relative motion, we have to apply corrections for the "length contraction" and "time dilation" and "Breach of simultaneity". If we do that a host of contractions and dilations follow. The mass of a moving body, for example, appears to be less.

Till recent years it was unanimously believed that the theory of relativity also implied that there cannot be any particle with a speed exceeding the velocity of light. Nowadays, however, it is believed by some that this is not true : the existence of particles called tachyons, with speeds exceeding that of light, does not contradict the special theory of relativity. The controversy, however, continues, and as yet no tachyon has been detected.

These are erudite matters and it is best not to discuss them here. Even the simple length contraction and time dilation appear to contradict common sense after seventy-three years of relativity. Let us note that if we do not apply corrections for time dilation and length contraction in establishing correspondence between frames, the laws of physics would look different in different inertial reference frames. That would contradict the Principle of Relativity. We do not want that, for we simply believe in the Principle of Relativity. So we have to accept these facts, however queer they may appear. There is no way out.

Conrad and Colonialism : *Heart of Darkness*

SUPRIYA CHAUDHURI

The complexity of Conrad's work is not simply in his themes but in the relations between these themes and the materials of the stories. This recognition, apparently simple, is not always enforced. The easy proliferation of symbolist readings of Conrad, the limiting of response and interpretation to certain recurrent themes like exile, guilt, betrayal and loneliness, obscures for us the fundamental importance of the contexts in which these are found. Recent criticism of Conrad tends to isolate those psychological or stylistic elements in the novels which, considered in the abstract, can relate Conrad to more modern writers. I think it is necessary to insist that it is the actual backgrounds of the stories which clarify, reinforce and indeed justify these elements.

This is especially the case when Conrad seems deliberately to be commenting on history, when the external situation is not simply a background but something to be grasped and understood. Conrad's difference from other writers who treat of the colonial experience is in the quality of his detachment and sympathy; unlike Kipling for instance he seems an outsider, involved in an effort to understand where others might be content to assume. Certainly the actual stuff of life in the colonies is not as important to him as it is to Kipling ; he is not interested simply in describing. In the early Malay stories his vision is very much that of an observer, involved but critical, able to make connexions, and to judge in a way that more rooted writers could not do. In these individual tragedies of European involvement with the East we encounter the characteristic Conradian problems of alienation, guilt and the need for discipline. These are issues that return to perplex us in every one of Conrad's novels, but we should notice that the central problem—the need to cling to principle of one kind or another because of the unfamiliarity or hostility of external circumstances, the absence of any defined set of values and standards, the sense of strangeness and loneliness—is an integral part of the colonial experience. Conrad's concern is with characters who have failed to retain their integrity or self-restraint, have been betrayed by the gap between ethic and advantage, or have found the means to survive either in a saving illusion or in the devotion to duty : Almayer, Willems, Marlow in *Youth*.

Conrad's central effort to present these problems is—apart from that great and complex work, *Nostromo*,—in one short novel, *Heart of Darkness*. Of this work we could say that colonialism *is* in fact its subject. Conrad returns here to the same area of his experience —the Congo episode—out of which he took the early short story *An Outpost of Progress* : an account of two white traders, insignificant and commonplace, who disintegrate in solitude and strange surroundings ; finally one shoots

the other and hangs himself. Conrad's own comment on this story might be true of *Heart of Darkness* : "all the bitterness of those days, all my puzzled wonder as to the meaning of all I saw—all my indignation at masquerading philanthropy have been with me again while I wrote."[1]

Heart of Darkness itself, Conrad said, is experience pushed only a very little beyond the facts[2]. Conrad's own trip to the Congo in 1890 may have been a turning-point in his life : he is reported to have said, evidently with some exaggeration, to Garnet that "before the Congo I was a mere animal". His reasons for taking a job with the *Societé Anonyme pour le Commerce du Haut Congo* were largely those ascribed to Marlow in the novel —the fascination exerted upon him by the map of Africa, and "one river especially... resembling an immense snake uncoiled".[3] Conrad returned from the Congo after four months, physically in a state of collapse ; and thirty-three years after those experiences he had not lost his indignation at the cruelty and greed of Europeans engaged in "the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of human conscience and geographical exploration".[4] When Conrad went to the Congo he had started to write *Almayer's Folly* ; *Heart of Darkness* was written eight years after.

The meaning of *Heart of Darkness* is much debated, as if it were possible to locate a meaning at the heart of Marlow's search for Kurtz, while in fact it is the *search* for meaning and the haze of meanings surrounding "an inconclusive experience" that are the point of the story. Of this we are warned at the start: the meaning of this episode is not in its heart, "not inside like a kernel" but in the way it is experienced. The opening analogy with the Roman conquest of Britain, enforced by a remarkable visual parallel between the darkness of the Thames and that of the Congo, provides the terms in which Marlow sees his story : "The conquest of the earth, which mostly means the taking it away from those who have a different complexion or slightly flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look into it too much. What redeems it is the idea only."[5] Marlow's trip to the Congo is partly in search of this saving *idea*, of the principle on which colonizing is conducted.

The start to the episode is not reassuring : the Company's city office in Brussels, with the grass sprouting through the paving stones, the Defargian women in the outer room and the story of Fresleven's death and the grass growing through his bones in an abandoned village. The somewhat explicit symbolism of all this makes us as uneasy as Marlow is with the confusion of motives attributed to him ; his aunt's vicarious philanthropy, her enthusiasm over his civilising mission of "weaning those ignorant millions from their horrid ways" ("I ventured to hint that the Company was run for profit") are in this context grotesque. The same confusion, in remarkable coincidence, is to be found in Leopold's annexation of the Congo in the interests of commerce and philanthropy. Henry Morton Stanley's account of this, in *The Congo and the Founding of Its Free State*, published in 1885, the year Leopold formally became *Souverain de l'Etat Independant du Congo*, is particularly interesting :

"our purpose is threefold : philanthropic, scientific, and commercial. They are [*sic*]

All quotations from Conrad's writings are made from the Uniform Edition, London, 1923-8.

1. Letter to Fisher Unwin, 22 July 1896, in *A Conrad Memorial Library ; the Collection of George T. Keating*, New York, 1929, pp. 61-2.

2. Author's Note : *Youth, A Narrative and Two Other Stories*, p. xi.

3. "Heart of Darkness" : *Youth*, p. 53.

4. "Geography and Some Explorers" : *Last Essays*, p. 17.

5. "Heart of Darkness" : *Youth*, p. 51.

philanthropic, inasmuch as our principal aim is to open the interior by weaning the tribes below and above from that savage and suspicious state which they are now in, and to rouse them up to give material aid voluntarily."[6]

Stanley's book was, substantially, a plea for capital investment in the exploitation of Africa, the "remunerative enterprise" for which he had been campaigning since his first return from the Dark Continent. This to him was a charitable mission, its object being to "rescue Africa from the slough of despond and inutility" and to promote "the true civilising influence which are seen in the advancement of commerce and Christian missions".[7] For most Victorians there was no inconsistency in this conjunction: Palmerston had visualized commerce as "leading civilization with one hand, and peace with the other, to render mankind happier, wiser, better."[8] The annexation of the Congo, which from 1885 to 1908 was the *personal property* of Leopold II of Belgium, was a remarkable instance of imperialism whose sole driving force was commercial greed : what Stanley approvingly called an "enormous voracity". Such philanthropic aims as were involved were inextricably confused with the economic motive; political considerations or larger ethical principles were practically not invoked.

Conrad, who is one of the few nineteenth-century writers to connect imperialism with egoism,[9] evidently doesn't look for the idea behind empire in the dubious philanthropy of commerce. Marlow's search for Kurtz is in the hope of something that might more truly redeem man from the consequences of his own rapacity, an unselfish belief that can make sense of all these proceedings. Marlow is confronted everywhere with meaninglessness: Fresleven's death, the Swede who hangs himself on the road for no apparent reason—the country or the heat, no one exactly knows. Coasting past the shore, his isolation amongst the crew of the steamer and his separation from the land seems to keep him "in the toils of a mournful and senseless delusion". The mysteriousness is not in the continent; it is Marlow's lack of contact with it, the condition of the coasting passenger, that makes the spectacle appear meaningless and oppressive. The action of the surf, the savages in the canoe are natural and straightforward : they need no excuse for being there. What seems to lack reality, confound the sense of the scene, is the colonial presence. Even the names of the ports sound unreal; the French gunboat, "there she was, incomprehensible, firing into a continent", is felt by Marlow to be part of an insane farce.

At the Company station we are faced with nothing but the spectacle of appalling waste, blindness and cruelty—a rapacious and pitiless folly. The black tribesmen who have been pressed into service and are dying of disease and starvation in unfamiliar surroundings have no means of comprehending what has happened to them: "Black shapes crouched, lay, sat between the tree leaning against the trunks, clinging to the earth, half coming out, half effaced within the dim light, in all the attitudes of pain, abandonment and despair."[10] *Heart of Darkness* is in its way as savage an indictment of the atrocities of Leopold's rule in the Congo as Roger Casement's *Congo Report* of 1903, made when he was the British

6. Letter to Mr. Albert Jung, 7 January 1879, in *The Congo and the Founding of Its Free State : A Story of Work and Exploration*, by H. M. Stanley, London, 1885, Vol. 1, p. 30.

7. *Ibid.*, p. xv.

8. Hansard 3rd ser. LX col. 619, 16 Feb. 1842, quoted in *Africa and the Victorians : The Official Mind of Imperialism*, by R. Robinson and J. Gallagher, London, 1961, p. 2.

9. "Autocracy and War" : *Notes on Life and Letters*, p. 107.

10. "Heart of Darkness" : *Youth*, p. 66.

Consul at Boma, or the accounts of Edmund Morel. Yet the nature of the book is not documentary : Conrad though recording the effects of detribalization and forced labour is concerned less with particular cruelties than with the essential moral illegitimacy of colonial rule. For the African "criminals", law like death is an insoluble mystery ; in Marlow's horrified disgust and pity we are made conscious of the complete irrelevance of the European social order in this strange land. The traders and the tribesmen exist in a state of mutual incomprehension ; to the settler the native is, as Fanon puts it, "the unconscious and irretrievable instrument of blind forces".[11] It is in this conflict, endemic to imperialism, that Conrad finds terms for a parallel with the tension of the known and the unknown in human consciousness.

The rhetorical imprecision of *Heart of Darkness* is a critical problem of some complexity. Marlow's painful hesitance, his backtracking, his uneasy reliance on such words as "inscrutable", "incomprehensible", "mysterious", all point to language being strained, here, beyond its normal limits ; Marlow feels constantly that it cannot express what he sees. for many this is proof of the essential insubstantiality of Conrad's rhetoric, the hollowness at the heart of what seems enormously significant. Of Kurtz's language and what is said of him this may, designedly, be true ; but in the language of the novel as a whole what seems vague, muffled or inadequate reflects an important limitation in Marlow's own experience. We should not confuse expression of failure with failure of expression ; Marlow is conscious that what happens here in the darkness will not yield to language or analysis because he cannot understand it.

If Marlow, then, calls Africa an implacable force brooding over an inscrutable destiny, a wilderness that is oppressive and incomprehensible, we should realize that he is reduced to these terms because he feels his separation from it. The wilderness is a mystery to him and to us because we have no business with it ; the colonial presence is itself "a fantastic invasion". Conrad is not, in this novel, describing Africa or what kinds of savagery go on it. Marlow's concern is rather with why the Belgians, the "pilgrims", the Eldorado Exploring Expedition, are there : apparently quite unfathomably except in the chaos of greed and folly. The total lack of relation between the colonizers' exploitation and the life of the continent make both appear equally anarchic. One is saved from a complete surrender to this anarchy by devotion, as Marlow realizes, to work, to surface realities, to duty. The accountant at the station, efficient, rigid, narrow, is to be respected because he has *that* kind of integrity. Yet to preserve this entails that he "hate those savages", whose presence is so much at odds with his fanatical devotion to correct entries. The work ethic which preserves sanity is also ultimately inadequate, because it refuses to recognise what is around it. This is why Marlow is so impressed by the stories he is told of Kurtz, who is remarkable in that he has an *idea*, a principle or vision to which he is committed, which might redeem cruelty and folly, make sense of the colonizers' presence, and establish terms wherein to understand Africa. Kurtz is "a prodigy ; an emissary of pity and science and progress" ; he is at the same time the Company's best agent and has collected vast quantities of ivory.

Marlow's trip up the river takes him further into the mystery of this experience, and involves him more deeply in its consequences. For although he too might seem to cling to the work ethic, to the actual needs of steering the steamboat so as not to be tempted ashore "for a howl and a dance", Marlow is not con-

11. *The Wretched of the Earth,* by Franz Fanon, trans. by C. Farrington, London, 1965 ; "Concerning Violence".

fined to this narrow salvation. It is in the terms of his imaginative apprehension of the whole of what he sees that we read the story. As he drifts by it, the wilderness seems "like evil or truth, waiting for the passing away of this fantastic invasion"—a silent land, mysterious in its concealed life. Even Stanley felt this when he wrote of "the unspeakable loneliness" and silence of the African forest: but this wilderness, he felt, had been made by two centuries of the slave trade, and would be removed in the coming age of fruitful commerce. For Marlow, though, the wilderness is still there, and commerce, clearly, has brought no light with it. The stubborn details of what Marlow sees : the savage uproar on the banks, the restraint of the cannibal crew of the boat, the eager loyalty of the harlequin Russian, Kurtz's last disciple, are to him insoluble mysteries, yet they show man inexplicably still to be man, even in this wilderness. And indeed such realizations are more disturbing even than the sense of total alienation. Marlow is shaken by the thought of his "remote kinship with this wild and passionate uproar" on the banks, for what seems strange and anarchic is in him as it is in these savages. It is to belittle Conrad to suggest that the whole experience is psychic. Africa here is a felt presence, it exists : but it will remain finally unknown so long as men seek to use it simply to gratify the anarchy of their own desires and greeds. In this sense Africa is what you make of it.

All of these realizations are brought together as Marlow at last encounters Kurtz. Kurtz contains and doesn't contain the meaning of the novel: the meaning is what Marlow makes of his whole journey, but that journey's ambiguous end is Kurtz. All Europe, we are told, contributed to the making of Kurtz; and, enormously articulate, he *has* expressed the imperialist idea, from its beginnings in lofty altruism to its ironic end in "Exterminate all the brutes !" Marlow's search for the idea behind empire thus ends in the moral chaos of a Kurtz; for Kurtz, sometime member of "the gang of virtue", has himself surrendered to the lust for power and the consciousness of exercising it. He has not discovered the wilderness; the wilderness has whispered to him things about himself which he did not know. He lacked restraint, we are told, in the gratification of his various lusts; he has allowed himself to be deified, and his victims are not even enemies or criminals, but "rebels". At the heart of the darkness we find the heart that is compounded of darkness, and this might prompt us to read the whole novel as the account of an interior journey, and to assign to Africa a symbolic rather than literal meaning. Yet surely there is, here, the inescapable sense that this surrender to anarchy is peculiarly the product of an encounter with a wilderness not understood on any terms save those provided by greed, the thirst for power, and the intoxication of solitude. The unspeakable rites that Kurtz engaged in have no final relevance : Conrad is not interested in anthropological enquiries. Like James, he is interested not in what happens, but what it means to the persons involved. Kurtz sees the horror in his heart because he surrenders to the self. Yet Kurtz is remarkable, too, because he has lived through it all to the end, and realized the horror that is at the heart of such an experience. It is for this that he commands Marlow's paradoxical loyalty, as he commanded the devotion of the harlequin Russian—"Oh, he enlarged my mind!"[12]— and Marlow forms with him one of those unexpected partnerships that we find in Conrad's novels, like that between the captain and the murderer in *The Secret Sharer.*

Bertrand Russell thought Conrad a man who "thought of civilised and morally tolerable human life as a dangerous walk on a thin crust of barely cooled lava which at any

---

12. "Heart of Darkness" : *Youth*, p. 140.

moment might break and let the unwary sink into firery depths."[13] Certainly this is Marlow's feeling when, shocked and ill, he returns to Brussels. He feels the ignorance and danger of ordinary people around him, for what happened to Kurtz can happen to man anywhere. Yet Marlow is conscious that it happened in Africa because of the exceptional kind of situation in which one man found himself, and he pays for this sense with a lie. He conceals the truth of the episode. This kind of concealment is related to the silence in Kipling, even in Forster, as to what the colonial experience really consisted of : a silence that enables one to go on living with pretences. We might imagine that what Conrad takes out of this is very much what Kipling does ; the uncompromising devotion to conduct, to duty, to surface realities. Yet this is not really so : Marlow is not a Singleton or McWhirter. The sense of the corrosive force of material interests—the basis of Conrad's greatest novel, *Nostromo*—and the response of Marlow's imagination to the whole of what he sees are here far more profound and disturbing. The radical pessimism of *Heart of Darkness* is a challenge to all defences of the imperial idea.

13. *Portraits from Memory*, by Bertrand Russell, London, 1956, p. 82.

Politics and Politicians

FAIYAZ AHMED

Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedies. Pray, do not at this early point lose patience with me. Turn on the pages and condemn me, if you must, for indulging in ignominious vituperation against the noble and dignified institution of politics. I assure you, I am as sceptical and scientific and modern a thinker as you will find anywhere and the above statement, which may or may not have put you on the rampage, is not mine; they are the words of a man much more remarkable than me: H. L. Mencken, American social philosopher and critic. So much for politics.

What about the politicians? How should we characterize these extraordinary men who have so ingeniously led the world into its present condition? Should we classify them as those who wish to realize heaven on earth thereby raising hell in the meantime? (Of course, the "meantime" is indefinite). Or, should we, like Dryden, describe them as,

Damned Neuters, in their Middle way
of steering,
Are neither Fish, nor Flesh, nor good
Red Herring.

Whatever be our own conceptions (or misconceptions), it is nevertheless agreed that politics and politicians are two sides of the same coin. Everyone of us entertain our own ideas and opinions about the subject; some hate, others love, some commend, others condemn.

The influence of the rulers over the ruled have been very great ever since the dawn of history. When Gregory the Great sent a mission for the conversion of England, King Ethelbert of Kent had already a Christian wife, and was soon persuaded to become a Christian himself. His subjects did likewise. Similarly, when Essex lost its Christian king and he was succeeded by sons who reverted to paganism, their people followed the example. In the modern world, it would not be much difficult to produce a humane and reasonable population, but many governments dare not do so for fear that such people would fail to admire the politicians who are at the head of such governments.

Human history has been greatly influenced by the desire of the rulers to thrust their personal whims and passions upon the ruled; whether for evil or good of the community concerned is a conjectural issue. Thomas More was beheaded for refusing to recognize Henry VIII as head of the Church of England. Lincoln justified the slaughter of Americans by Americans on the ground that democracy defined as government of the people, for the people and by the people, should not perish from the earth. Mrs. Indira Gandhi justified the compulsory sterilization of Indians by Indians on grounds of "family welfare". More and Lincoln had their point, I leave the Shah Commission and the Union Cabinet to judge Mrs. Gandhi.

In politics, airing one's views in public often leads to disastrous results. The Janata Party which was based upon mutual misunderstanding has already started crumbling, now that

its members are understanding one another.

Henry Clay, in a speech delivered in 1829, compared the government to a trust and its officers to trustees and asserted that "both the trust and the trustees are created for the benefit of the people". Thus laws are formulated for the purpose of punishing the criminals and curtailing illicit activities. Yet it is strange how ridiculous laws can simetimes be. For instance, under the Blasphamy Law, in England, it is illegal to express disbelief in the teachings of Christ. It is also illegal to teach what Jesus taught on the subject of non-resistance. One concludes that a man who wants to escape becoming a criminal must profess to agree with the teachings of Christ, but not say what that teaching was. "If the law supposes that," said Mr. Bumble in Dickens' *Oliver Twist*, "the law is a ass, an idiot." He was right.

The appointment of commissions and committees to probe into this or that affair is not an uncommon phenomenon, especially in a democracy. Although it would be foolish to deny the merits of this system, sometimes however, the conclusions arrived at by these commissions are singularly enigmatic. For example, after the plague and the Great Fire, during the reign of Charles II in England, a House of Commons Committee was asked to inquire into the causes of these misfortunes. The committee attributed the catastrophe to Divine displeasure and decided that what most displeased the Lord was the works of Mr Thomas Hobbes. It was decreed that no work of his should be published in England. This measure proved effective : there has never since been a plague or a Great Fire in London. But Charles II, who liked Hobbes, was annoyed. He, however, was not thought by Parliament to be on intimate terms with Providence.

In India the system, has become a fad ever since the Janata assumed power. Some months ago a commission was appointed to investigate into the causes leading to a railway accident in Orissa. In its report, the commission attributed the disaster to "supernatural causes", since all human factors were operating normally. The report, however, did not suggest the course of action to be taken against Providence This seemed to me to be a bit unfair, but that merely proves how sunk I am in moral depravity.

"The freedom of the press," to quote George Mason, "is one of the great bulwarks of liberty." But, it is discouraging to note that the relations between the Press and the Politicians have seldom been so cordial as to encourage much confidence. Bismarck, the Chancellor of Germany, was irked by "the outrageous way I am misquoted by irresponsible rumour-mongering journalists." One day W. H. Russell, London's top foreign correspondent of *The Times*, reminded Bismarck, "You'll have to admit that I am one newspaperman who has respected your confidence. You have conversed with me on all sorts of subjects and never once have I repeated a word you said." Bismarck cried angily, "The more fool you ! Do you suppose I'd ever say a word to a man in your profession that I didn't want to see in print?" What private griefs politicians have, alas, I know not. For they are all, all honourable men.

I could go on like this for years ; but the curtain must ultimately be drawn. I depart with a final word. Government demands ability to govern: it is neither Mr Everybody's business nor Mr Anybody's business but Mr Somebody's. If democracy is not to ruin us we must at all costs find some trustworthy method of testing the eligibility of candidates before we allowed them to seek election. When we have discovered such a test human life will attain that splendour which has been the dream of those who have sacrificed themselves for it. Meanwhile, God save you, if there be such a being, but at all events take care of yourselves.

The Presidencians of Today
A Statistical Profile

The Statistics Department of Presidency College is currently conducting a small-scale sample survey as part of the College Science Improvement Programme (COSIP) sponsored by the University Grants Commission. The aim is to obtain an authentic picture of the undergraduate student population of the College —to know about their academic and family backgrounds and their interests, as well as to have their views on some of the important issues of the time. While the schedule of enquiry was drawn up by the teachers, the actual work of drawing the random sample and that of interviewing the sample members was carried out by the Third Year Statistics Honours students of the College. At the time the survey was started, there were in all 710 undergraduate students on the College rolls. A random sample comprising 25% of this student population was selected, but till the writing of the present preliminary report it has been possible to interview no more than 59 students out of the chosen sample. Considering that there are now only seven students in the Third Year Statistics Honours class (and one of them is a habitual absentee), this is no mean achievement! It is expected that COSIP grants will be available in the 1978-79 session as well and it will be possible for the new Third Year Statistics Honours students, to cover the remainder of the sample.

Among the 59 students interviewed so far, 26 are Arts students (13 of them boys, 13 girls) and 33 are Science students (19 boys and 14 girls).

Their academic background

In the course of the survey, the percentage of marks secured by the students at the last public examination was recorded. This was in the majority of cases the Higher Secondary or an equivalent examination. The following table shows the frequency distributions of marks separately for the B.A. and the B.Sc. students :

TABLE 1 : Frequency distributions of percentage marks for the B.A. and the B.Sc. students in the sample.

Percentage marks	B.A. students	B.Sc. students
Below 60	1	1
60—65	12	7
66—70	6	10
71—75	2	9
76—80	2	3
Above 80	1	3
Total	24	33

The average percentage score is 66 for B.A. students and 70 for B.Sc. students, the standard deviation being 6 in each case. The difference between the two averages is quite expected because it is easier to score higher marks in Science subjects and also because of the more stringent conditions that are used for Science students while admitting them to the College. The two averages also give a somewhat precise idea of the level of students who can get admitted to this College.

Their family background

Each of the students in the sample was asked whether he/she belonged to a joint family or not. The following table has been drawn up on the basis of their answers :

TABLE 2 : Frequency table showing the distribution of students according to sex and family type

Family type	Male	Female	Total
Joint	10	11	21
Single	22	16	38
Total	32	27	59

The high proportion of students coming from joint families is striking.

Data were also collected on the family size of the students. The frequency distribution of family size is shown below :

TABLE 3 : Frequency distribution of family size for the students in the sample

Family size	Frequency
3	3
4	17
5	15
6	11
7	4
8 or above	9
Total	59

It is thus seen that about 34% of the students come from families of size 4 or less, while about 59% come from families of size 5 or less. The nodal size is 4. The mean size is 5·4 with a standard deviation of 1·5. The general smallness of family size may be attributed to the preponderance of students from upper middle class Calcutta families in Presidency College.

As regards the educational level of the parents, it has been found that for more than 90% of the students, the fathers are either graduates or have higher academic attainments. Similarly, for more than 90% of the students the mothers have passed the secondary (or matriculation) examination or a higher examination. A fuller picture may be had from the following table :

TABLE 4 : Frequency distribution of students according to the educational level of parents

Educational level	Father	Mother
Illiterate	0	1
Primary	0	4
Secondary	2	17
Intermediate	3	19
Graduate	28	11
Post-graduate	12	7
Technical	8	0
Others	6	0
Total	59	59

The occupational pattern of the parents is also of some interest. Among the 59 students in the sample, 34 reported that their fathers were in service, 8 said that they were in trade or commerce, 8said that they were in independent professions, only 1 had his father in agriculture, 5 had theirs in other occupations and 2 students had their fathers without any occupation. Most of the mothers were without any gainful employment, there being just 6 in service and 3 in trade or commerce, or in independent profession.

The distribution of students according to monthly family income is shown in the table below :

TABLE 5 : Frequency distribution of students according to monthly income of family

Monthly family income (Rs.)	Frequency
Up to 250	0
251— 500	2
501—1000	8
1001—2000	35
Above 2000	13
Total	58*

* In this and some other tables, the total is less than 59 since some of the interviewees declined to give the required information.

It is thus found that most of the students come from families in the monthly income brackets Rs. 1001—2000 and Rs. 2001 or more. There are only 10 from families with monthly income of Rs. 1000 or less. Thus although admission to Presidency College are now-a-days made solely on merit and a good student from a poor family has nothing to prevent him/her from getting admitted to the College, thanks to the numerous forms of financial assistance available, Presidency College continues to be dominated by students from the higher income brackets.

Conditions in which they live and study

It has been found that 42·4% of the students come to College from their own homes, 49·2% from rented houses, while the remaining 8·4% live in hostels or with their relatives. The distance of the College from a student's residence ranges from 0·1 km. to 30·4 km., the mean distance being 7·4 km. with a standard deviation of 5·6 km. The mode of transport used for coming to College is public bus in 71·2% of the cases and tram in 10·2% of the cases. Family cars are used by 3·4% of the students and the remaining 5·6% just walk the distance between residence and College.

Among the students interviewed, 49·2% have their separate study rooms, 49·2% have to share their study rooms with others, while the other 1·6% do not have any rooms that may be used solely or mainly for study purposes.

Their interests

Only 2 out of the 59 students (i.e. 3·4%) reported that they do not read any of the daily newspapers. As far as the others are concerned, the most favourite daily is *The Statesman* (71·2%), the *Ananda Bazar Patrika* coming a not-so-close second (59·3%). Again, 4 out of the 59 (i.e. 6·8%) reported that they read no periodicals at all.

As many as 6 among the 59 (i.e. 10·2%) confessed that they read no books other than text-books or reference books. As to the others, the most favourite area is, of course, literature. The following table shows the percentages corresponding to the different areas. (Note that the total exceeds 100 since some of the students favour more than one area.)

TABLE 6 : Percentages of students favouring different areas for reading as a hobby.

Area	Percentage of students
Literature	64·4
Science and science fiction	15·3
Sports literature	5·1
Political literature	6·8
Others	23·7

Among the 59 students in the sample, 47 (i.e. 79·7%) are members of a library or libraries other than the Presidency College Library.

Students' participation in games, whether indoor or outdoor, has become somewhat rare. This is especially true of girl students, as the following table shows :

TABLE 7 : Distribution of students according to participation in games (indoor and outdoor)

	Indoor games	
Whether participate	Males	Females
Yes	25	11
No	7	16
Total	32	27

	Outdoor games	
Whether participate	Males	Females
Yes	20	5
No.	12	22
Total	32	27

It has been found that most of the students are actively interested in one or more of the fine arts. The table below indicates the number (and also the percentage) of students conversant with some of the most important among them :

TABLE 8 : Number and percentage of students actively interested in some of the fine arts.

Area	Number of students (p.c.)
Vocal music : classical	9 (15·3)
light	22 (37·3)
Instrumental music	9 (15·3)
Recitation	10 (16·9)
Drawing and painting	17 (28·8)
Modelling	1 (1·7)
Others	1 (1·7)

The type of entertainment most favoured by the students is the cinema, the number of shows per month varying, from student to student, between 1 and 8. (This number probably includes film shows on the TV channels.) The average number of shows per student works out at about 2·6 per month.

Their opinions

The students were asked to give their general opinion on the facilities offered by the College. To 27·1% of the students the facilities are below their expectations, 67·8% think the facilities are up to their expectations, while the remaining 5·1% think these are above their expectations.

The students were also asked to suggest measures that would improve the academic atmosphere of the College. The percentage of students favouring each of the suggested measures is shown below :

TABLE 9 : Percentage of students favouring each of the suggested measures for improving the academic atmosphere of Presidency College

Suggested measure	Percentage of students
Better teaching	33·8
Greater discipline	40·7
More tutorials, fewer lectures	30·5
More tutorials, more lectures	27·1
More frequent examinations	44·1
Better library and seminar facilities	44·1
Others	11·8

(Note that many of the students favoured more than one measure, so that the sum of the percentages in the above table is far greater than 100.) Among the "other suggestions" (of the above table) made by the students are: ensuring more seriousness on the part of the teachers, ensuring better teacher-student relationship, modernisation of the syllabi and mode of teaching, regular showing of educational films, etc. At least one student is in favour of "the removal of vested interests from the teaching staff".

The question of a change in the present status of Presidency College has been discussed in academic circles for some time now. Let us see what the students of the College think on this subject. Among the students interviewed in the course of the survey, 66·1% would like the College to be changed into an independent university, 20·3% are in favour of an autonomous status for the College under the University of Calcutta, while the remaining 13·6% think that no change is called for.

When asked to give their views for or against the semester system, most of the students (86·4%) said they were in favour of the system. As regards possible reforms of the present examination system, 52·7% of the students were found to be in favour of the usual closed-book type exams, 16·4% in favour of open-book exams, and 30·9% in favour of exams that would be based on a mixture of the two types. Among these

students, only 3·4% favoured the usual essay-type questions (with problems), 61·0% favoured objective-type questions (with problems), while the remaining 35·6% thought that every exam should make use of both types of question.

The students also gave their views on the duration of the degree course. Most of them (78·0%) were in favour of a Pass course of 2 years duration and an honours course of 3 years duration.

The question what should be the medium of instruction for university education is currently being hotly debated in academic circles in this State. The following table shows the distributions of the students interviewed by favoured medium of instruction for both undergraduate and post-graduate levels :

TABLE 10 : Distributions of the students interviewed according to their views on medium of university education

Favoured medium	Undergraduate level	P.G. level
English	39 (67·2%)	46 (79·3%)
Mother tongue	19 (32·8%)	12 (20·7%)
Total	58(100·0%)	58(100·0%)

Thus most Presidency College students think that English should continue to be the medium for both undergraduate and post-graduate education, although they may have other views on the medium that should be appropriate for the primary, secondary and higher secondary levels.

Presidency College students have often taken an active part in political movements. When asked about the desirability or otherwise of being involved in politics, most of the students interviewed (70·7%) said that students should take an interest in politics but should take no active part in it, 20·7% thought they should take an active part, while only 8·6% thought that they should take no interest at all.

The typical Presidencian of today

In the light of the data thrown up by the survey, we may try to form an idea of the typical Presidencian of today. This typical Presidencian is almost as likely to be a boy as to be a girl. He/she has got admitted to the College after getting very high marks at the last public examination. He/she comes of a Calcutta family that has 4 or 5 members and has a monthly income of more than Rs. 1,000/-. The father is at least a graduate and the mother has at least passed the secondary (or matriculation) examination. The father is in service, while the mother has no time, or inclination for gainful employment after looking after the family. The student comes to College by bus from a distance of 6 km. or so. He/she has a separate study room which he/she may share with others.

The typical student is a reader of *The Statesman* and is fond of literature. He/she may or may not participate in sports but is devoted to one or more of the fine arts. He/she views about 3 films per month, including those presented on the TV channels.

He/she thinks that teaching and other facilities offered by the College is up to his/her satisfaction, but can probably be improved. He/she is in favour of greater discipline, more frequent exams and better library and seminar facilities. He/she would like that Presidency College be changed into an independent university.

The typical Presidencian favours the semester system. He/she is in favour of the usual closed-book type of exam but would like the questions to be of the objective type or requiring problem-solving. He/she would like English to continue as the medium of instruction at both the under-graduate and post-graduate levels.

The typical Presidencian takes an interest in politics without being actively involved in it.

REPORTS*

NEWS FROM THE DEPARTMENTS

ARTS

BENGALI

The Bengali Seminar has functioned well under the guidance of Professor Baidyanath Mukhopadhyay. The Seminar Library has catered to the needs of both under-graduate and post-graduate students. With the help of a U.G.C. grant, the department has recently set up a second library.

Madan Mohan Coomar
Head of the Department of Bengali

ECONOMICS

The long tradition of quality teaching and research that this department has built up over time has been maintained during the last two years. This is reflected in the academic attainments of the students and the research activities of the Centre for Economic Studies (CES) attached to the department.

The UGC appointed an Expert Committee for reviewing the work of the CES during the period 1972-77. This Committee visited the CES in July 1977. In their report the Committee commended the work of the Centre and the Department, and strongly recommended further expansion programmes. The UGC has since accepted *in toto* these recommendations and has approved a substantial expansion for the CES for another period of five years; implementation of the expansion programme is expected to start shortly.

It is a pleasure to report that the performance of our students at the university examinations continues to be excellent. In the B.A. final examinations of 1975 and 1976, five students in all obtained first class. In the B.A. final examination of 1977, eight of our students secured first class marks. In 1977, eight of our students obtained first class marks in their Part I examinations. One need not add further statistics to demonstrate a similar story for our post-graduate students. As in other years, this year also a number of our students have won scholarships and are expected to leave shortly for higher studies in some of the best universities abroad.

Professor Dipak Banerjee, who was away on one year's leave to the University of Manchester as a Hallsworth Research Fellow, has rejoined the department in November 1977. Professor T. S. Bhattacharya, who was here

* Some of the reports have been translated and edited for the sake of uniformity.
—*S.B.* September, 1978.

during Professor Banerjee's absence has resumed the Headship of the Economics Department of Maulana Azad College, Calcutta. A former student of this college, Shri Biswajit Chatterjee, has joined the department as a Lecturer in April 1977. The department and the Centre have been further strengthened by the appointments of Dr. Ashis K. Banerjee in July 1977 and of Shri Satish Ch. Mishra in July 1978 as Research Associates. Dr. Banerjee, a former student of the College, did his Ph.D. from Johns Hopkins University, U.S.A. and Shri Satish Mishra, B.A. (Oxford) is enrolled as a Ph.D. student at the University of Cambridge, U.K.

An important study on "Production and Investment Planning in Indian Iron and Steel Industry—Hindustan Steel Limited", undertaken by the Steel Project Committee of the Centre for Economic Studies, has now been completed. This study was sponsored by the Hindustan Steel Limited; Dr. Ramprasad Sengupta, then Research Associate, was the major contributor. This study is one of the first of its kind in India and has been appreciated as an important contribution in the field of applied economic research. Dr. Sengupta, who is at present Associate Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, had a continuous association with the department for more than one decade and his valuable contributions to the activities of the Centre deserve special mention. Altogether seven Junior Research Fellows are currently engaged in research work under the supervision of senior teachers of the department. Three former Junior Research Fellows are expected to submit their theses for the Ph.D. degree this year and one former Senior Research Fellow has already submitted his thesis.

Another important aspect of the research activities of the Centre has been the regular seminars and workshops in which distinguished scholars from different institutions (here and abroad) participate. This year we have an impressive list of visitors who addressed seminars on a variety of topics. They include Professor Tapas Mazumdar of the Jawaharlal Nehru University and Professor P. R. Brahmanand of the University of Bombay—both National Lecturers in Economics; Dr. Narindar Singh, Jawaharlal Nehru University, Professor Mukul Majumdar, Cornell University, U.S.A., Prof. N. K. Chaudhuri, University of Toronto, Canada, Dr Debesh Bhattacharya, University of Sydney, Australia, Professor D. C. Bhattacharyya, University of Calcutta, Dr. Rizwanul Islam, Dacca University, Bangladesh and Dr. Partha Shome, University of Washington, U.S.A. In addition, Dr. Bhabatosh Datta, Chairman of the Centre and Emeritus Professor of the department gave an illuminating talk last November on 'Some Recent Trends in Indian Banking'. Besides, Mr. Bhaskar Dutta, Research Associate, Delhi School of Economics and Dr. Ashis Banerjee, Research Associate at our Centre, have also offered short courses on 'Some Aspects of Social Choice Theory' and on 'Theories of Stochastic Processes in Economics' respectively.

The Department is now looking forward to new faces and new facilities which should be available under the UGC assistance for the next five years.

Dipak Banerjee
Head of the Dept. of Economics

ENGLISH

The highlight of departmental activities over the past twelve months was a lecture delivered by Dr. R. K. Dasgupta, Director of the National Library. The talk was on Milton's *Paradise Lost*, with special reference to the Invocations in the poem. Among seminars there was one on P. G. Wodehouse, at which Prodosh Bhattacharya and Shormishtha Panja were the speakers. Early this year

Ruchir Joshi won the first prize at a competitive seminar on twentieth-century drama organised by Loreto College ; his subject was "Force and Fantasy in Samuel Beckett". There have been a few record recitals, and the perennial favourite in this respect appears to be Shakespeare. With a growing collection of tapes—including a couple of plays read and preserved on cassette by students of the department—one can expect similar programmes in future. One such project will be a reading of Eliot's poetry, in his own voice.

Ananda Lal
Secretary, English Seminar.

HISTORY

[*For some unknown reason, the* 1975-76 *issue of the* Presidency College Magazine *failed to publish college news and reports of departmental activities. After that, there has been no publication of this magazine. We, therefore, present here a triennial report of what we have been doing, instead of the usual annual one.*]

In August 1975, our revered teacher and Head of the Department, Professor C. P. Banerjee, passed away. His sudden death was followed by a period of turmoil in the department. However, as soon as Professor Hiren Chakrabarti took charge as the new Head in October 1975, the department was placed on an even keel and devoted itself to productive work in the academic and extra-academic fields.

Examination Results

Three of our students obtained first classes in the B.A. Hons. examination of 1975, two in 1976 (in spite of Calcutta University's inscrutable ways), and, unfortunately, none in 1977. There are, however, two first classes in the B.A. Hons. (Part I) of 1977. In the M.A. examination of 1976, we produced as many as six first classes. One of our students has been awarded the State Scholarship for 1978 and will be going to Cambridge for higher studies.

Educational Tours and Seminars

In February 1977, the teachers and students of the department made an extensive tour of the temples and forts of Central India. We visited Khajuraho, Kalinjar, Chitrakut, Amarkantak, Nachna-Kuthra and Bandhogarh.

In December 1975, Dr. John Rosselli of the University of Sussex gave a seminar on Indian nationalism and Prof. David Selbourne of Oxford talked to us about 'China Now'. During 1976, we had a number of interesting guest speakers : Dr. Alvin Z. Rubinstein of the University of Pennsylvania spoke on 'Sino-American-Soviet Relations', Dr. Leonard A. Gordon of the City University of New York on 'Bengal and the Partition of India', Dr. K. N. Chaudhuri of the School of Oriental and African Studies, London, on 'Quantitative Methods in the Study of Indian History' and Col. G. S. Dhillon of Red Fort Trial fame enthralled us with his reminiscences of Netaji and the I.N.A. We were glad to be able to have with us during 1977 Dr. Barun De of the Centre for Studies in Social Sciences, Dr. J. R. McLane of North-Western University, U.S.A., and Dr. A. J. H. Latham of Swansea University, U.K. Dr. De analysed the role of Calcutta in the Indian national movement ; Dr. McLane tried to take a new look at the origins of the Congress ; and Dr. Latham discussed 'India and the International Economy 1870-1914'. In addition to these special lectures, the Undergraduate Seminar attempted to hold group discussions among themselves. Sugata Bose, Kumkum Banerjee and Subhas Sircar served as Secretaries of the Undergraduate, History Seminar in 1975-76, 1977 and 1978 respectively. The last History Reunion was held on a grand scale in 1975 at the initiative of Prof. Ajoy C Banerjee and

two very enthusiastic senior students, Bhaskar Chakrabarti and Suranjan Das. We are planning to hold another reunion in the near future. Our fellow-student Suman Chattopadhyay, who has always shown unflagging zeal in all departmental affairs, will take charge of this event.

Teaching and Research

The present teaching staff consists of Profs. Hiren Chakrabarti, Rajat Ray, Ajoy Banerjee, Sunil Chatterjee, Pradip Lahiri, and Subodh Majumdar. Mr. Soumen Bhattacharya and Dr. Hossainur Rahman taught for some time in this department during the period under review. We wish the Government would stop making our teachers play musical chairs.

Dr. Hiren Chakrabarti continues to serve on the editorial board of *Bengal Past and Present* with distinction. He has also been elected Hony. Treasurer of the Calcutta Historical Society. He has at present seven research students working under him,—five of Calcutta University and two from abroad. Dr. Chakrabarti and Prof. Ajoy Banerjee presented papers at the International Netaji Seminar held under the auspices of the Netaji Research Bureau in 1976. Dr. Rajat Ray has been contributing regularly to scholarly journals in India and abroad. He recently gave lectures on the modern Bengali novel and on political crisis in Calcutta at the Nehru Memorial Museum, New Delhi, and on 'Subhas Bose and Calcutta Municipal Politics' at the Netaji Research Bureau, Calcutta.

* * *

Much more important to us than our academic attainments, however, has been the unique spirit of *camaraderie* among members of the department in recent years. Our teachers we have found to be readily accessible. We, students, have met as much as possible outside class and outside college hours, often for outings to various places in the outskirts of Calcutta, and have developed friendships cutting vertically across the different 'years'. All problems we have faced and solved together. Future students of this department will undoubtedly continue the tradition of academic brilliance, but we shall be really sorry if the feeling of oneness in the department is lost.

S. Bose

Secretary, Post-Graduate History Seminar

PHILOSOPHY

During the last one year, Dr. S. K. Nandi has been transferred from this department, and Shri Ardhendu Sekhar Bhattacharya and Shri Manik Bal have joined.

N. C. Chakravarti

Head of the Dept. of Philosophy

POLITICAL SCIENCE

Selected teachers of the Department have continued the tradition of giving lectures at M.A. classes on invitation by Calcutta University. Thus four of the six teachers of the Department are part-time teachers either at Calcutta or Burdwan University or at both.

Individual teachers carry on research on their own, and work as research guides for teachers of other institutions. For instance, two teachers, one belonging to Narkeldanga Gurudas College, and another belonging to the IIT, Kharagpur, have been awarded the Ph.D for theses prepared under the supervision of our Head of the Department. He is also supervising the preparation of two other doctoral dissertations. Among the other teachers. Dr. Sunil Rai Chaudhuri has under him four research workers working for their Ph.D. and Dr. Amal Kumar Mukhopadhyay is supervising the preparation of eight Ph.D. theses. One dissertation prepared under Dr. Mukho-

padhyay's guidance has already been awarded the Ph.D. The *Socialist Perspective* continues to be edited by him.

Two distinguished scholars, namely, Shri Sukumar Sinha, Deputy Director of Census Operations, West Bengal, and Dr. Asoke Mitra, visited the Department and addressed the teachers and students. The subject of the first lecture was "Social Texture of Calcutta." Dr. Mitra spoke on "Centre-State Relations in India." Both evoked keen and widespread interest.

The Head of the Department has been nominated a member of the Calcutta University Council.

Dr. Arun Kumar Banerjee, Assistant Professor, has joined the International Relations Department of Jadavpur University as Reader. His vacancy has been filled by Shri Anjan Sarkar from Jhargram Raj College. Dr. Rebatiraman Mukherjee, Assistant Professor has been transferred to Chandernagore College, and has been succeded by Dr. Prasanta Ray who comes from Hooghly Mohsin College. Shri Phanindranath Bhattacharyya, Assistant Professor is under orders of transfer to Hooghly Mohsin College.

Prasanta Roy
for N. C. Basu Roy Chaudhuri
Head of the Dept of Political Science

SCIENCE

BOTANY

The University examination results of the department have been good as usual with seven and three First classes in the last B.Sc. Part II and Part I examinations respectively and with no failures. The research activities of the department are proceeding as before with a number of research scholars working on different aspects of plant life. Besides this, two college teachers are carrying on research work in this department under the Faculty Improvement Programme, sponsored by the U.G.C. This department has conducted two major botanical excursions—one to study the flora of Western Ghats and the other to study the floral distribution in the Eastern Himalayan region. In addition, a number of one-day botanical excursions were organized. The Botanical Association of the department has been regularly publishing the wall magazine *Ankur*. It has also organized a few cultural functions. Under the COSIP programme, sponsored by the U.G.C., University Professors and Scientists of various research institutes have delivered lectures on various scientific topics, and under the audio-visual programme film shows and wall picture and specimen displays have been organized for the students of this department. Our Under-Graduate students submitted scientific projects to the Seminar organized by the Science Association of St. Xavier's College, Calcutta.

A. K. Kar
Head of the Dept. of Botany

CHEMISTRY

The Chemistry Department carried out their co-curricular activities as usual. The department arranged several seminar lectures by many eminent scientists under the COSIP programme. Professor Stuart Mclean, Professor of Chemistry, University of Toronto, Canada, delivered an interesting and instructive lecture on Organic Chemistry. The students took the initiative in arranging the departmental Reunion last year for the first time in the history of the department. On that occasion was published a souvenir that included valuable scientific articles. Dr. S. C. Shome retired from the post of Principal, Presidency College, in January 1976 and subsequently he was re-employed as Professor and Head of the Department of Chemistry in this College. On expiry of his re-employment

period, he has been appointed by the U.G.C. as a retired professor to continue his teaching and research in the same department.

Dr. D. N. Chatterjee, Professor of Chemistry, took charge as Head of the Department of Chemistry.

D. N. Chatterjee

Head of the Dept. og Chemistry

GEOGRAPHY

The following COSIP lectures were delivered :

(*a*) Professor B. Banerjee (Geography Department, Calcutta University)—Indian Agriculture.

(*b*) Shri S. K. Ghosh (Former Regional Director, Eastern India, Meteorological Department)—Climate of India.

(*c*) Dr. S. Basu (Senior Ecologist, Anthropological Survey of India)—Environment and Its Impact on Tribal People of India.

(*d*) Professor S. Munshi (Indian Council for Social Science Research)—Development of Rail Transport in India.

(*e*) Dr. N. R. Kar (Director of Public Instruction, West Bengal)—Population of India.

The Head of the Geography Department of Presidency College was invited by the Sociology Department, Kalyani University, to give a talk (on Growth ond Evolution of Calcutta) under the auspices of the U.G.C.

Shri Pannalal Das, Lecturer, has received the degree of doctorate of Calcutta University for his thesis "The Land Capability Study of the Kaliagha River Basin."

Last year's M.A. and M.Sc. results were excellent. All four students secured first class and three of them obtained the first three positions. The B.A./B.Sc. Part II results were also good. Six out of fourteen obtained first class.

The Geography Seminar is at present doing a map project on "Primary Education in West Bengal".

The Seminar Library meets the demand of the staff and students. It contains more than 5,000 books and journals. Besides, there are about 4,000 maps and topo sheets

Our department is well aware of the saying —Travelling is a part of education. The Geography Department organises a number of field tours every year. The students recently made excursions to Rajasthan, Hariyana, Punjab, Himachal Pradesh, North Bengal, Sikkim, Gujarat and short tours in Nazat, Haldia and Bakkhali. The annual re-union was held on 30 April at Phuleswar.

Seema Paul

Secretary, Geography Seminar

GEOLOGY

The department maintained its high standard of academic performance during the session 1977-78. There were 70 students in the undergraduate and postgraduate classes and 12 Junior and Senior Research Fellows. Five students obtained Class I in the B.Sc., Part II Examination 1977 and another five in the M.Sc. Examination 1975 of Calcutta University, results of which were declared during the year. One Research Fellow obtained the Ph.D. (Sc.) degree of Calcutta University.

As in previous years, students of different classes were taken out to different parts of Bihar, Madhya Pradesh and Karnataka for field work.

Dr. M. K. Bose, Assistant Professor, was awarded the Dr. S. S. Bhatnagar Prize for 1976. Dr. S. K. Deb, Assistant Professor, was awarded a visiting research fellowship at the Charles University, Prague, for one year.

The department, however, lost one of its ablest teachers in the untimely death of Dr. T. R. Sarbadhikari, Assistant Professor, on 7 June 1978

Members of the staff and Research Fellows continued their research activities and published about 10 papers in Indian and foreign journals this year. The departmental students' forum, the Geological Institute, functioned well during the year and arranged a number of lectures by distinguished geologists. It published its annual journal, *Bhu Vidya,* as a commemoration volume to mark the passing away of Prof. S. Ray, formerly Head of this department.

The department has been granted Rs. 10 lakhs by the U.G.C. for a major research project on 'Crustal Evolution and Metallogenesis in Some Selected Parts of the Indian Precambrian Shield.'

A. K. Banerjee
Head of the Dept. of Geology

MATHEMATICS

The results of the students of B.A. and B.Sc. Mathematics Honours during the session 1973-76 are as follows :

No. of First Class	Nil
No. of Second Class	4

Results of the next batch, that is, 1974-77 are—

No. of First Class	1
No. of Second Class	7

Dr. P. Chaudhuri, formerly Principal, Chandernagore Government College, joined the college as Professor and Head of the Department on 10-2-78.

The following four members of the Department who were on transfer, have made over charge : Prof. S. S. Mukherji, Prof. S. K. Mapa, Dr. R. N. Das, Prof. K. K. Das, Prof. C. K. Chatterjee and Prof. M. R. Adhikari have joined the Department.

Under the COSIP Scheme the following distinguished teachers delivered a series of lectures to the students and teachers of the Department : Dr. M. C. Chaki, Head of the Department of Pure Mathematics, Calcutta University, Dr. Ambarish Ghosh, Prof. of Electronics, ISI, Dr. M. R Gupta, Reader, Department of Applied Mathematics, Calcutta University and Prof. R. K. Ghosh, Dean of the Faculty of Science, St. Xavier's College, Calcutta.

Under the Teacher Fellowship Scheme Shri S. N. Upadhyaya, Lecturer, Sripat Singh College, Jiaganj, Murshidabad, is working on problems of Quantum Mechanics under the supervision of Prof. S. C. Ganguly.

Pritindu Chaudhuri
Head of the Dept. of Mathematics

PHYSICS

COSIP programme

Under this programme, there have been quite a few lectures intended for the undergraduate students of Physics. The first lecture was delivered by Prof. A. Mukherjee of the City University of New York. Two more series of lectures were delivered by Prof. C. K. Majumdar, Palit Professor of Physics, Calcutta University and Dr. M. Saha, Lecturer in Physics, Calcutta University.

Examination Results

The examination results in B.Sc. and M.Sc. classes are as follows :

B.Sc. Part I (1977) : 1st Class—16 ; 2nd Class—14.
B.Sc. Part II (1977) : pending
M.Sc. (1976) : 1st Class—4 ; 2nd Class—1.

Research activities

Research activities continued mainly in three sections, e.g. X-rays, Solid State Physics and Relativity and Cosmology.

Seminars and Symposia attended

A few seminars and symposia were attended by Professors and research associates recently. Two of Prof. B. S. Basak's research students attended the National Conference on X-ray and crystallography at Anan in 1978.

Prof. A. K. Raychaudhury was invited to lecture on "Present position in Cosmology" at the Eighth Conference on "General Relativity and Gravitation" at Bhavnagar. He also delivered a course of three lectures at the T.I.F.R., Bombay, on "Some aspects of Braus Dicke theory". Three of Prof. S. Sengupta's students attended the Nuclear Physics and Solid State Physics symposia in November 1977 at Pune.

B. S. Basak

Head of the Dept. of Physics

PHYSIOLOGY

Under the COSIP programme, eminent physiologists delivered lectures on various topics, much to the benefit of the students, who have thereby developed an aptitude for original research. There has been excellent co-operation between the post-graduate and under-graduate students in the research projects undertaken by the department. It is a pity, however, that since it is not possible owing to lack of space to offer special papers to M.A. students, several of our graduates are preferring to read for the M.A. degree directly under Calcutta University. If some special arrangement is not made for the post-graduate classes, post-graduate studies in this department, with its long tradition of nearly 80 years, may have to be stopped.

Research work has been progressing satisfactorily. Two of our research students have submitted their dissertations to the University.

Two of our experienced teachers were transferred elsewhere by the Government during this year. Students are enjoying the privilege of borrowing books from the Seminar Library as usual, but there is no place where they can consult the 'reference' books.

A. K. Mukherjee

Head of the Dept. of Physiology

STATISTICS

The teaching work of the Department went on smoothly during the year under review. However, since Dr. M. K. Gupta, Assistant Professor, left in April 1976 to join as Professor and Head, Department of Statistics, Kalyani University, no regular arrangement has been made to fill in the post in spite of repeated reminders to the authorities. Shri Tapas Chandra Chandra, an ex-student of this Department joined temporarily as a Lecturer on 1-4-77 but subsequently resigned on 1-10-77. Dearth of adequate space is another serious problem this Department has long been facing and this is one of the factors mainly standing in the way of starting post-graduate teaching here.

During the year under review, a few interesting lectures were arranged under the COSIP programme on various topics of Statistics. The speakers included Shri A. Bhattacharyya, an ex-Head of this Department, Dr. M. K. Gupta, Department of Statistics, Kalyani University, Dr. S. P. Mukherjee, Reader in Statistics, Calcutta University and Dr. P. Mukherjee, Dy. Director of Industries, Government of West Bengal.

Arrangements are being made to mimeograph a rare collection of some valuable notes on "Geometric Approach to Sampling Distribution" by Professor A. Bhattacharyya.

A Socio-Economic-cum-Opinion Survey on the current batch of students of this College has been undertaken by the teachers and students of this Department.

The students of this Department were taken to Xavier Labour Relations Institute and TISCO, Jamshedpur, on an educational excursion during the year.

A. M. Gun

Head of the Dept. of Statistics

ZOOLOGY

Under the COSIP scheme the department arranged several lectures by eminent scholars. Dr. S. Ghosal spoke on 'Bio-synthesis of

Protein and Structure and Function of Chromosome'; Prof. J. N. Rudra on 'Evolution of Heart and Arterial Arches in Vertebrates'; Dr. R. Dutta on 'Sericulture in West Bengal'; Dr. A. Bose on 'Organisor Concept and Organogenesis' and Dr. B. Dasgupta on 'Recent Development of Malaria Parasite and its Control'. The department also tried to impart practical knowledge on different branches of the subject : preparation of culture media and maintenance of Drosphilia Culture, preparation of Polytene Chromosome, development of toad, chick and duck, histochemical techniques, and physiology of digestion in some insects.

Mr. Sabyasahi Majumdar and Mr. Subhendu Das Mahapatra are attached to this department as Teacher-Fellows working for the Ph.D. of Calcutta University. Mr. Majumdar is working on 'Parasitic Helminthology in the branches of Schistosoma and Paragonimus'. Mr. Das Mahapatra's subject is 'Trematode Helminths in the branches of Echinostomes and Amphistomes in relation to their immediate hosts'.

Two students received first classes in the last B.A. Honours examination. Dr. A. K. Banerjee, Dr. A. Sinha, Dr. H. Banerjee, and Shri R. Guin have been transferred. They have been replaced by Shri R. Bhattacharya, Shri A. Chatterjee, Dr. S. Bhattacharya and Dr. K. K. Das. Prof. S. N. Roy Chowdhury retired from this department in February 1979. The post is still lying vacant.

R. Bhattacharya
Head of the Dept. of Zoology

THE COLLEGE LIBRARY

On 31 March 1978, the College Library had in its collection 1,26,941 books and 15,129 bound journals. In addition to this, there is a large volume of invaluable periodicals and journals in desperate need of binding. During 1977-78, 1,23,931 volumes were used by teachers, research scholars and students. Of these, 44,231 books and journals were home-issues.

During the last three years, expenditure on purchase of books and journals was as follows : 1975-76 : Rs. 1,64,221.69 ; 1976-77 : Rs. 2,71,270.00 ; and 1977-78 ; Rs. 1,20,401.73.

The increase in the number of students and the spurt in research activities in several departments have, for quite some time past, putting tremendous pressure on the skeleton library staff. If the library is to function effectively, it is imperative that additional men be appointed forthwith to reinforce the presently over-burdened team. There is one especially pressing man-power problem. In August 1976, the sole cataloguer of the Library left, and since then this post has been lying vacant. As a result, the work of cataloguing new acquisitions to the library is being seriously hampered.

It is one of the primary duties of the library to preserve properly books, journals and valuable manuscripts, which are in its possession. In order to accomplish this task, regular dusting of the book-racks is a minimum requirement. In spite of repeated requests to the authorities over the 21 last years for the appointment of two dust-bearers, there has been no response.

At present, the Arts Library and the Economics and Political Science Library are facing an acute space shortage. If these libraries are to develop any further immediate measures for suitable expansions have to be taken.

A proposal has been made to the authorities to keep the library open for longer hours. Needless to say, this would immensely benefit students and research workers.

Last February, in the death of Shri Ratikanta Mondal, this library lost a dedicated worker.

R. Bhattacharjee
Librarian

College News

The demand for an 'autonomous' Presidency College is as old as the college magazine itself. Earlier this year a team of the University Grants Commission visited our college to investigate at first hand our case for autonomy, especially at the post-graduate level. Apart from holding consultations with the teachers of all the departments separately, the members of the team also met a students' deputation. They assured the students that they were all in favour of creating an autonomous institution in Presidency College which would be deemed to be a University and would strongly recommend such a measure. It now lies with the Government of West Bengal and the University of Calcutta to implement this recommendation.

Our examination results have as usual been brilliant, but we can hardly congratulate ourselves on our performance in the extra-academic field. However, in an inter-collegiate debate for the Sarat Chandra Bose Shield, Suman Chattopadhyay (History) of our college made a fine speech in Bengali to win the Best Speaker's award. The Students' Union organized a few film shows in the college auditorium.

Shri Satyajit Ray has been awarded an honorary doctorate by Oxford University for his great contribution to the art of film-making. His old college feels proud of the new laurel that he has won for himself and for his country.

We recall the achievements of the eminent educationist and mathematician Shri Bhupati Mohan Sen, who passed away on 23 September 1978. After a brilliant academic career at Cambridge University, he joined the Indian Education Service. He was Principal of this college from 1931 to 1943.

Students of the Department of English will miss the lectures of Profs. Sukanta Chaudhuri and Supriya Chaudhuri, who are going to Oxford University on Inlaks Scholarships. Several of our students are also going abroad for higher studies : Dilip Mukherjee is going to the London School of Economics, Sugata Bose (History) to Cambridge, Anita Mehta (Physics) to Oxford, and Debraj Ray and Subhasis Gangopadhyay (Economics) to Cornell.

By the time this magazine comes out, Presidency College will be having a new batch of students. We extend to them a very warm welcome and hope that they will hold the name of the college high and enhance its prestige.

September 1978. S.B.

P.S.—Shri Sushilchandra Chatterjee, Senior Associate Government Pleader in the Alipore Civil Court, who died in January 1979, was a double first in History from this College (B.A. 1924, M.A. 1927). The letters which he received from his teacher Kuruvilla Zachariah were collected and published in the *Presidency College Magazine* of 1973 ('Yours Affectionately, K. Zachariah', with notes by Dr. Nilmani Mukherjee and Dr. Hiren Chakrabarti). Our heartfelt sympathy to the bereaved family.

Editorial

Perhaps the most daunting thought in the mind of a fresher in Presidency College is that he or she would have to live up to a 'tradition'. Five years ago it had daunted me. But then I found that 'the great Presidency tradition' had become more of a cliché than anything else, that during one's active undergraduate years one is much too involved with the present to give much thought to an obscure legacy handed down by past generations. Editors of recent numbers of this magazine have referred to the 'values' for which this college is always supposed to have stood, but there has been a tendency to take these for granted, to accept superficially without investigating their true substance. When I was asked to edit this issue of the *Presidency College Magazine* at the fag end of my college career. I suddenly found that I had to grapple with this 'tradition', still far from well-defined, but invested with a new force that I had not felt during the last five years. While going about the task of producing this slender volume, I sought to identify from the pages of its illustrious predecessors the main strands of the tradition of this college and its magazine that is customary for an editor to uphold.

The cover of the first issue of our magazine, published in November 1914, was the cause of several raised eyebrows. The light blue cover with a design and the title printed in a deeper blue ink did not, quite understandably, appeal to the aesthetic sense of many students. In the next issue the editor explained that "the cover represents the college colours—light blue and dark blue—the combination of the colours of Oxford and Cambridge". This little episode gives us a clue to the chief element in the Presidency College tradition—the imitation or, let us say, the assimilation of the liberal education of the West, as exemplified by such premier universities as Oxford and Cambridge.

Another component of our college tradition on which our forbears laid great importance was the corporate life of the members of the college. In fact, the college magazine was launched with the express purpose of being "an organ of the corporate life of the college". The early numbers of the magazine bear adequate testimony to the existence of an active College Union, energetic debating and drama societies, regular seminars, an interesting common-room and hostel life and a great enthusiasm for games and sports. The college magazine was truly "an expression of the common life and a quickener of its activities". One is struck by the constant striving to achieve intellectual and social cooperation.

It was soon after the outbreak of the First World War that the *Presidency College Magazine* made its first appearance. The first editorial note read : "A wave of loyalty has touched the shores of the Overseas dominions of the Emperor. The peoples of India accept the British cause not only as subjects of the British Empire, but as comrades in a struggle for existence, as vital to their interests as to those of any other part of the Empire. The despatch of Indian troops to fight on European soil for the first time in history, the

voluntary grant of all the expenses of the Indian expeditionary forces from the Indian exchequer are significant facts. They give happy assurance of the steady development of better fellowship throughout the British empire ... We believe that among educational institutions our college may claim to have been the first which expressed its sympathy with government ..." This first editorial set the tradition of loyalism for our college magazine. One cannot help feeling amused to read Principal H. R. James' address to the students of the college printed in the same number : "Patriotism in Bengal was a product of British rule ... one thing patriotism in Bengal should not do, is to direct the national spirit into an attitude of hostility to British rule." The elite among the students of Presidency College which was placed in charge of the college magazine was willing enough to agree with their Principal. Sometimes slaves revel in their slavery.

The tradition of loyalty, and even sycophancy, to the Raj was, however, one of the *Presidency College Magazine* and probably not of the college as a whole. It is well known that at a time when the editorial columns of the magazine waxed eloquent about "a wave of loyalty", the Eden Hindu Hostel was suspected to be a den of terrorists. The college magazine usually mentioned our leaders of the national movement only in obituary notices when they died, and the references were not always complimentary. There was an especially cantankerous editorial note on Deshabandhu C. R. Das after his death ; we find evidence of a general show of protest and torn leaves of that issue of the college magazine were strewn in the verandah in front of the common room. Deshabandhu himself, of course, was an alumnus of the college and the record shows that there were innumerable men who became ardent patriots and front-rank nationalist leaders in spite of their Presidency College education.

It is not without reason that I have dwelt at length on the loyalist tradition of the college magazine. The question of the editorial policy of our magazine with regard to the political and educational establishment of our country has assumed very serious proportions during the last ten years. To this matter I shall turn presently.

In respect of this variegated Presidency College tradition, where do we stand today? Is the great tradition of academic brilliance being maintained? Presidency College, of course, continues to sweep all the top places in University examinations. But, the acquiring of a University degree of dubious value is perhaps the least important aspect of a college education, especially of a college which started with notions of achieving the Oxbridge ideal of a great liberal education. The daily academic routine of our college is largely filled with boring lectures, and if one happens to overhear the conversation of a section of the students which is bent on accepting the dregs of the contemporary culture of the West or to listen to the puerile and doctrinaire political discourses and wranglings in the college portico and the canteen, one might be tempted to jump to the conclusion that the intellectual level of the college has plunged to abysmal depths. In spite of these aberrations, however, it is my impression (and not wishful thinking, I hope) that there are still some young men and women in our college who try to think for themselves and who have a capacity to give expression to their thoughts. We have this year not been able to emulate the excellence of literary standard of some of the previous numbers of our college magazine, but I hope this issue will at least convey the news that all is not lost. A stifling and oppressive socio-economic environment has not yet been able to crush totally the creative spirit and vitality of the students of this college. There are, however, no signs of a coming renaissance.

It is indeed sad to note the lack at present of any collective desire among the students to promote all healthy forms of extra-curricular activities. There has been little trace of a corporate life of which this magazine could be the organ. The debating and drama societies, the Rabindra Parishad and the Social Service Department have become moribund. Presidency College students have in the past taken a leading part in organizing flood and famine relief and participated in census operations. In the face of the devastating floods that have played havoc in several districts of Bengal, one would have expected the students of the best known and best-endowed college in the State to have been much more enterprising than they have been in arranging relief for the flood victims. What can be the cause of this strange ennui that seems to have gripped the student community of our college? That this is a fairly recent phenomenon cannot be doubted. In the late sixties and early seventies, our college was one of the chief centres of radical politics in West Bengal. During the brief interregnum of peace in 1973 and 1974 also, I have seen our students make significant contributions to the extra-academic life of the student community of the city as a whole. Apart from the distinction our students achieved in inter-collegiate competitions, what was more encouraging was the evidence of a team-spirit. Scores of enthusiastic supporters would not hesitate to travel a long way to listen to an important debate or to watch a play being staged somewhere by our students. Nowadays our college goes unrepresented in most inter-collegiate meets and there is little evidence of cultural activity inside the college. The onset of this sorry state of affairs can be related to the loss of values and intolerance which engulfed the entire educational world and from which even our college could not remain immune. The educational authorities must be held responsible to a large extent for events coming to such a pass. The only language they were willing to understand was the language of intimidation and violence. As a result, the initiative passed out of the hands of those who might have harnessed the creative energies of our students. When a new group won the Students' Union elections earlier this year, one had naturally hoped that there would be a new spurt of activity in the college. But, perhaps it was too much of a negative victory.

While still on the subject of the crisis in our college life, I would like to particularly stress two ominous cleavages which militate against the corporate spirit. One is a cultural-economic dichotomy, the other a stark political divisiveness. A section of students coming from well-to-do families and English-medium schools deem the college corridors to be an admirable site for holding fashion-parades, and they display a disgusting, supercilious attitude towards the rest of creation. On the other hand, a large number of students coming from Bengali-medium schools and economically weaker sections of society, instead of relying on their inner strength, remain awestruck of their more aggressive 'anglicised' college-mates and sometimes develop unfortunate complexes. It is about time the college authorities cracked down on the unnecessary show of opulence inside the college, or it might spell disaster for the harmonious development of our college life. The bitter political animosity between groups of students of our college must also be removed. The urgent need of a united students' movement cannot possibly be exaggerated. Unless we students can form one political platform where different ideologies will compete for acceptance by the general body of the students, we shall continue to be used as political cannon-fodder by professional politicians and the student community will never be able to make its own impact felt on society. I fervently hope that future students of this college will address themselves to these pressing problems, and that the current malaise in our collective life will prove to be a passing phase.

The tradition of a basic loyalty to the establishment, which characterized the college magazine since its inception, had a definite bearing on its strengths and weaknesses. Reading the back numbers of our magazine, one finds literary and scientific articles of the highest order (though sometimes too specialized to be of general interest) but hardly anything of great pitch and moment on contemporary social and political themes. The magazine of 1968-69, commonly known as the Naxalite number, which the editor of a subsequent issue described as "a shocking assault on all that the *Presidency College Magazine* stood for and on the values so long held sacrosanct", threw the traditional deferential attitude towards the establishment to the winds. To my mind, the destruction of the loyalist tradition was only to be welcomed ; what was unfortunate, however, was that in the process the tradition of a certain intellectual sophistication also became a casualty. If falsehood is the sign of non-conformism, the editorial in the last issue of the college magazine (1976) was also a non-conformist one.* However, the less said about that dishonourable editorial the better.

We decided as a matter of policy for this issue that every opportunity should be given for free discussion of all aspects of contemporary society, and more especially, the role of our college in the present situation. We have printed a few articles which may prove to be somewhat controversial. We hope there will be a good debate on these after the magazine is published. Perhaps a small dose of shock treatment will help the college come back to life. Let us not forget that our college takes the lion's share of the limited educational resources of the State. We must never stop asking ourselves whether we are fulfilling to the utmost our duty to Bengal and to India.

Sugata Bose.

* * *

Postscript :

There are no formal acknowledgements to be made, but this magazine owes much to many people. My revered teacher Professor Hiren Chakrabarti piloted the entire process of planning and printing this number ; it would be no exaggeration to say that but for his meticulous supervision this magazine would not have seen the light of day. Suman Chattopadhyay helped us tirelessly in every possible way ; Sumit Ranjan Das readily went through the articles on scientific subjects ; and we simply had to place an order with Tapati Guha Thakurta giving her less than a week's notice for a most engaging cover design. My warmest thanks are also due to our entire library staff, and to Shri Prabodh Krishna Biswas in particular, for giving me ready access at all odd hours of the day to old issues of the *Presidency College Magazine*.

September 1978 S. B.

* It was most unfortunate that the previous editor chose to calumniate Dr. S. C. Shome, an old and respected Professor, who was then the Principal of the College. Contrary to what was said in the last editorial, Dr. Shome was appointed Research Professor of Chemistry under a U.G.C. scheme after reaching the age of retirement.

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ ইতিহাসের প্রাক্তন ছাত্র। পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, (১৯২৭-২৮)। একদা লোকসভার সদস্য। আত্মজীবনী, "তরী হতে তীর"।

দীপেন্দু চক্রবর্তী ॥ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া শুরু করেন, শেষ করেন মৌলানা আজাদে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ান। শখঃ বামপন্থী নাটক লেখা।

সুমন চট্টোপাধ্যায় ॥ ইতিহাস নিয়ে এম, এ পড়ছেন—এই কলেজ থেকেই। শৌখিন বামপন্থায় অবিশ্বাসী, কিন্তু পরিবর্তনে নয়। চুল এবং দাড়ি বাল্মীকি-প্রতিভার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায়।

সুনীল চট্টোপাধ্যায় ॥ পেশা, ইতিহাসে অধ্যাপনা। নেশা, সাহিত্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রাক্তন ছাত্র। কবি।

শঙ্খ ঘোষ ॥ প্রাক্তন ছাত্র। যাদবপুরে বাংলার অধ্যাপক।

শৌভিক মজুমদার ॥ ইতিহাসের মৃদুভাষী ছাত্র। মাথা নিচু করে থাকতে ভালবাসেন।

সোমেশলাল মুখোপাধ্যায় ॥ অর্থনীতির ছাত্র। কফি-হাউসের নিয়মিত খদ্দের।

মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায় ॥ ১৯৭১-এ ইতিহাস নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসেন, পাশ করেন লেডি ব্রেবোর্ণ থেকে ১৯৭৭-এ। ভাবা গেছিল ১৯৭৪-এ 'গর্বিত বিদায়' (কলেজ পত্রিকা, ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য) নিয়েছেন। কিন্তু মায়া কাটাতে না পেরে ফিরে এসেছেন।

নন্দিনী বসু ॥ ইংরেজির ছাত্রী। আর কিছু লেখার মতন তথ্য হাতে নেই।

ভবানীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ॥ ভূ-তত্ত্বের প্রাক্তন ছাত্র (১৯৩৭-৩৯)।

তপোব্রত ঘোষ ॥ বাংলায় এম, এ পড়েন। হাতের লেখা দেখে প্রেসওয়ালারা ভীষণ খুশী।

তথাগত চক্রবর্তী ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে এম, এ পড়ছেন। অনর্গল বকতে পারেন।

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দর্শনের বিপ্লবী ছাত্রী।

গৌতম বসু ॥ ছাত্র অর্থনীতির। বিশ্বাসী বিপ্লবে, আপাতত আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছেন।

তপতী গুহঠাকুরতা ॥ ইতিহাসের ছাত্রী। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি; বিবাহের জন্য অভিভাবককে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হতে পারে।

আসাদুল ইকবাল লতিফ ॥ বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই এই ছোট্ট-খাট্ট মানুষটি এম, এ পড়ছেন ইংরেজি সাহিত্যে।

সুজিত বসু ॥ একই কেস, তবে বিষয় ইতিহাস।

রাহুল চৌধুরী ॥ ইতিহাস বিভাগের এম, এ· ক্লাসের ছাত্র। কাঁদো-কাঁদো মুখে স্ট্যালিনের বুলি আওড়ান।

সুদীপ্ত দাসগুপ্ত ॥ অর্থনীতি বিভাগে 'চিংড়ি' নামে সমাদৃত।

অমল রায়চৌধুরী ॥ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।

সুমিতরঞ্জন দাস ॥ পদার্থবিদ্যার ছাত্র, আদৌ অপদার্থ নন।

সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥ প্রাক্তন ছাত্রী, ইংরেজির অধ্যাপিকা।

ফৈয়াজ আহ্‌মেদ ॥ অর্থনীতি পড়ছেন এ-রকম গুজব।

সুগত বসু ॥ কেম্ব্রিজে ইতিহাস নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত। মাথাভর্তি বয়স। দেশাত্মবোধক গানে স্পেশালাইজ করেছেন। এই গ্রীষ্মে স্কাইল্যাবের সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটে আছড়ে পড়ার কথা।

Past Editors and Secretaries

Year	Editors	Secretaries
1914-15	Pramatha Nath Bauerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookerjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee Brajakanta Guha	Bimal Kumar Bhattacharya Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sirkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	
1926-27	Humayun Kabir	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kumar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattactarjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattactarjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti

Year	Editors	Secretaries
1934-35	Ardhendu Bakshi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen Nirmal Shandra Sen Gupta	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin	Bimal Chandra Datta
1940-41	Manilal Banerjee	Prabhat Prasun Modak
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46	No Publication	
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangapadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindramohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjay Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Badal Mukherji Mihir Bhattacharya	Alok Kumar Mukherjee
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee	Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu	Biswanath Maity
1965-66	No Publication	
1966-67	Sanjay Kshetry	Gautam Bhadra
1967-68	No Publication	
1968-69	Abhijit Sen	Rebanta Ghosh
1969-72	No Publication	
1972-73	Anup Kumar Sinha	Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee	Swapan Chakravarty
1974-75	Swapan Chakravarty	Suranjan Das
1975-76	Shankar Nath Sen	
1976-77	No Publication	
1977-78	Sugata Bose Gautam Basu	Paramita Banerjee